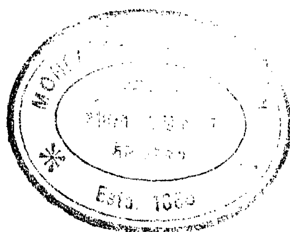
পোষ্টকার্ড



আমিনুর রহমান

কমলা পাব্‌লিশিং হাউস
৮।১এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

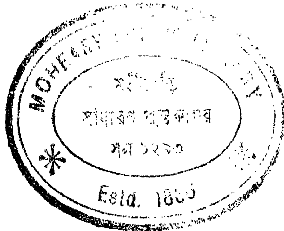
৭ই মাঘ, ১৩৫২

দু' টাকা

সত্যচরণ দাস কর্ত্তৃক ৯।এ, হরি পাল লেনস্থ আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এ মুদ্রিত ও ৮।১এ, হরিপাল লেন হইতে প্রকাশিত।

বাবাকে

দিলাম—



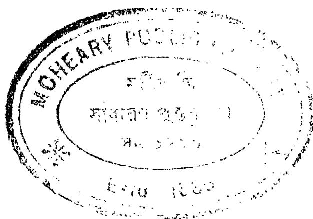
ভূমিকা

গভীর সেন্টিমেণ্ট, অগাধ অশ্রুজল এবং গহন ভাবারণ্যের দেশ এই বাংলাদেশে খাম অর্থাৎ এনভেলাপই যথার্থ গৌড়জনোচিত হৃদয় বৃত্তির বাহন, স্নেহাস্পদ শ্রীমান আমিনুর রহমান সেই উদ্দেশ্যে 'পোষ্টকার্ড' ব্যবহার করে যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এই বেপরোয়া ভাবই আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। যে সব ব্যাপার নিয়ে এদেশে সচরাচর কেঁদে ভাসাবার কথা, সেই সব জিনিষই ইনি হাল্‌কা হাসির তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে প্রয়াস করেছেন দেখে খুবই ভালো লেগেছে আমার। সহজ সাবলীল গতিতে তাঁর কলম চলে, তিনি তাঁর পরিবেশের মধ্যে চোখ বুজে বসে থাকেন না, চোখ চেয়েই চলেন এবং সাবলাইমের মধ্যে রিডিক্লাসকে খুঁজে বের করার দৃষ্টি তাঁর আছে, বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে এসব বড় কম কথা নয়। অনেক আশা নিয়ে আমি শ্রীমান আমিনুর রহমানের প্রথম হাল্কা গল্পের বই খানিকে সাধারণের দরবারে উপস্থিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আশা করি আমার আশা একদিন সমস্ত বাঙালী পাঠক সমাজের আশ্বাস হয়ে দাঁড়াবে। আমিনুর রহমান সম্বন্ধে আর একটা বড় কথা এই যে তিনি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সহৃদয় এবং তাঁর হালকা হাসির অন্তরালে হৃদয়ের গভীরতারও পরিচয় মেলে। সহজ এবং

সাধারণের প্রতি তাঁর যেমন আগ্রহ, অলৌকিক ও অসাধারণের দিকেও তেমনি তাঁর লক্ষ্য আছে। তাঁর অনেকগুলি গল্প এই থই থই জলের দেশে দ্বীপের ভরসা নিয়ে পাঠককে আশ্বস্ত করবে।

২রা জানুয়ারি
১৯৪৬
খালড়, বম্বে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস।



আমার কথা

পোষ্টকার্ড আমার জীবনের প্রথম লেখা গল্প, তাই বহু বন্ধু বান্ধবের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বইখানির নাম 'পোষ্টকার্ড' রাখতে বাধ্য হলুম। গল্প-গুলির মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে যে রস পরিবেশিত হয়েছে, তাতে রসিক-জনের কাছে বইখানির অন্যকোন রসাল নামই হয়ত উপযুক্ত ছিল।

আমার চোদ্দ পুরুষে কেউ কোনদিন গল্প লিখেছে বলে আমি শুনিনি, এবং আমি নিজেও যে কোনদিন গল্প লিখব এ আশা মনে পোষণ করিনি। কিন্তু তবুও, একদিন ঘটনাচক্রে গল্প আমায় লিখতে হ'ল, এবং যিনি এই কঠিন কাজটীতে প্রথম আমার নেশা ধরালেন, তিনি হচ্ছেন বন্ধুবর শ্রীকালিপদ ভট্টাচার্য্য। বন্ধুবরের সদিচ্ছা সফল হ'ল কি হ'ল না জানিনা। সেগুলিকে মুদ্রিত আকারে দেখবার সুযোগ দিয়ে যিনি আরও উৎসাহিত করলেন, তিনি হচ্ছেন, 'সচিত্র ভারতের' কর্ম্মধ্যক্ষ শ্রী রাধেশ চন্দ্র রায়। এঁদের উভয়ের প্রচেষ্টাই আমায় সাহিত্যিক করে তুলুক আর না তুলুক, সাহিত্যের আসরে যে জোর করে নামিয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাঁরা আমায় গ্রন্থকার করে তুললেন তাঁরা হচ্ছেন বন্ধুবর সাহিত্যিক শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাস। রেখার আঁচড়ে গল্পগুলিকে সজীব করে তুলতে এবং তাদের সম্মান রক্ষা করতে আমায় সাহায্য করেছেন শিল্পী শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়। আসল কথা প্রত্যক্ষভাবে আমি ঋণী হ'তে না চাইলেও, এঁরা ধরে বেঁধে আমায় যখন এই ভাবে তাঁদের কাছে ঋণী করেছেন, তখন রসিক পাঠকজনই এর বিচার করুন যে সত্যিই আমি ঋণগ্রস্থ কিনা।

প্রথিত যশা সাহিত্যিক ও সমালোচক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় আমার এই প্রথম সামান্য প্রচেষ্টাকে সাধারণের দরবারে পেশ করে আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করেছেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী।

পরিশেষে এই ব্যাপারে এঁদের সকলের ছাড়াও পর্দার আড়াল থেকে আর একটি রসিকা মহিলা, যিনি আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছেন এবং গল্পের প্লট যুগিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ না করলে ব্যক্তিগত ক্ষতি হতে পারে ভেবেই বলছি, তিনি হচ্ছেন আমার সহধর্ম্মিণী।



ফিলজফির প্রফেসর ডক্টর সেন অত্যন্ত ভোলা-মন। অবশ্য ফিলজফার মানুষের ওরকম হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু ডক্টর সেন যেন একটু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। হয়ত কলেজে যাচ্ছেন, কি একখানা বই পড়তে পড়তে ঘর থেকে বেরুলেন, গাড়ীতে উঠতে যাবেন ঠিক সেই সময় বইয়ের কোন বিশেষ জায়গায় এসে এমন মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন যে গাড়ীর পা-দানীতে একখানা পা রেখেই দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। সেদিন গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় কলেজ থেকে বাড়ী ফিরলেন ট্রামে করে ; নিজের বাড়ীর সামনে এসে গেটের ওপর নিজের নেম-প্লেটটায় দেখলেন লেখা রয়েছে, ডক্টর পি. সেন (আউট) অমনি নিজের মনে, "ওঃ আউট" বলে ফিরবার রাস্তা ধরলেন। বুঝি মনে করলেন গৃহকর্ত্তা বাড়ী নেই। ভাগ্যিস কাণ্ডটা মিসেস্ সেনের নজরে পড়েছিল তাই তাড়াতাড়ি চাকর পাঠিয়ে ভোলানাথ স্বামীকে ফিরিয়ে আনান্। আর

পোষ্ট কার্ড

একদিন লাইব্রেরী ঘরে একটা বইয়ের আলমারি খুলবার সময়ে চাবিটা ঠোঁটে চেপে তালার মধ্যে সিগারেট প্রবেশ করাতে গিয়ে আঙুল পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এমনি ধরণের উদ্ভট কাণ্ড প্রায় প্রতিদিনই ঘটে এবং মিসেস্ সেনও দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন।

কিন্তু ডক্টর সেনের সেদিনকার কাণ্ডটা একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি হয়েছিল বলে মনে হয়। সকালবেলা, কলেজে বেরুবার জন্য ডক্টর সেন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, হঠাৎ ড্রেসিং রুম থেকে তাঁর চীৎকার: কি? না, তাঁর একপাটি জুতো পাওয়া যাচ্ছে না। এইখানে বলে রাখা ভাল, যে এই জুতো-বিভ্রাট ডক্টর সেনের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। ড্রেসিং রুমে এক জোড়ার বেশি জুতো রাখলেই এ-জোড়া থেকে একটা ও-জোড়া থেকে একটা নিয়ে পায়ে দেওয়া তাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—তা একটা 'সু' হোক বা একটা 'নিউকাট' হোক্ কিংবা একটা ব্রাউন হোক্ আর একটা ব্ল্যাক হোক্। সেইজন্য ইদানিং মিসেস্ সেনের হুকুমে ড্রেসিং রুমে এক জোড়ার বেশি জুতো রাখা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গণ্ডগোল আইন মানে না, ঐ এক জোড়া জুতোর ওপরেই তার প্রভাব বিস্তার করে বসল। এখন সমস্যা একপাটি জুতো গেল কোথায়? সমস্ত বাড়ীতে খোঁজাখুঁজি সাড়া পড়ে গেল। ডক্টর সেন চীৎকার করে জানিয়ে দিয়েছেন, জুতো না পেলে তিনি সব ব্যাটাকেই তাড়িয়ে দেবেন। বাড়ীর ঝি, চাকর, ঠাকুর, ড্রাইভার, মালি, সবাই মিলে খুঁজতে লেগে গেল ছাদের চিলে-কোঠা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ঘরে, আলমারির নীচে, ড্রয়ারের ভেতরে, রান্নাঘরে, গ্যারেজে, চাকরদের কোয়ার্টারে, বাড়ীর চারিধারের কম্পাউণ্ডে—মোট কথা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়, এমন কি রাস্তার দুই মোড়ের দুটো ডাষ্টবিন পর্য্যন্ত উল্টে পাল্টে সমস্ত রাবিশ তন্ন তন্ন ঘেঁটে

দেখাও বাদ গেল না ; কিন্তু তবুও এক পাটি জুতোর হদিস্ মিলল না ; চাকর-বাকরগুলো ছুটোছুটি করে ঘেমে নেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গিন্নীমার সামনে দাঁড়িয়ে বোকার মত মাথা চুলকোতে লাগল। মিসেস্ সেন তাড়া দিয়ে



বললেন, "হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? কোনকথা শুনতে চাই না, জুতোটা খুঁজে বার করতেই হবে। যাবে কোথায় সেটা? ঠ্যাং গজাল, না ডানা মেলে উড়ে গেল?" দ্বিগুণ উৎসাহে আবার খোঁজার পালা সুরু হ'ল। ডক্টর সেন নিজেই মহা খাপ্পা হয়ে খুঁজতে

আরম্ভ করে দিলেন। সামান্য একপাটি জুতোর জন্যে কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে মিসেস্ সেন অন্য এক জোড়া জুতো পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু ডক্টর সেনের গোঁ, তাঁর ঐ হারানো জুতো চাই-ই; নইলে তিনি কি যে করে বসবেন তা নিজেই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। ব্যাপার খুব ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল, বুঝি লাখ টাকার দলিল হারালেও এতটা হুলুস্থুল বাধে না। কিন্তু উপায় নেই কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, তায় আবার তিনি ফিলজফার মানুষ, তাঁর খেয়াল মত সবাইকে চলতেই হবে। সুতরাং একপাটি জুতো বার করতে যদি থানায় ডায়েরী করতে হয়, কি পুলিসে খবর দিতে হয়, কিম্বা ডিটেকটিভ ভাড়া করে আনতে হয়, অথবা সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, তাও স্বীকার। হয়তো সবই হতো, যদি না বেলা তিনটে আন্দাজ সময় জুতোটা পাওয়া যেত। প্রশ্ন হতে পারে, এতোগুলো লোক, এমন কি স্বয়ং বাড়ীর কর্ত্তা সারা বাড়ী তোলপাড় করেও যা খুঁজে বার করতে পারল না, তা অত সহজে বেরিয়ে এলেই হলো? ইয়ার্কি নাকি? সেই কথাই তো হচ্ছে, জুতোটা কোথায় পাওয়া গেল, কে খুঁজে বের করল, কেমন করে তার সন্ধান মিলল সে সব আগে শুনুনই। ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না যদি ডক্টর সেনের হাঁকাহাঁকি শুনে প্রথমেই মিসেস্ সেন তাঁর কাছে যেতেন। তা না করে, 'কান নিয়ে গেল চিলে' শুনেই একবার কানে হাত না দিয়ে চিলের পিছনে ছুটতে গিয়েই এতো অযথা হৈ চৈ। ডক্টর সেন যখন চাকর-বাকরের সঙ্গে চোদ্দবার একতলা থেকে দোতলা আর দোতলা থেকে একতলা শেষ করে পনরবারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময় মাঝ সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল মিসেস সেনের সঙ্গে। চোখ দুটো কপালে তুলে, গালের ওপর বিস্ময় প্রকাশের জন্য প্রচলিত মেয়েলি প্রথায় দুটো

আঙ্গুল রেখে মিসেস্ সেন বলে উঠলেন, "ওমা একি ?" ব্যাপার কিছুই নয়, দেখা গেল ডক্টর সেনের এক পায়ে একটি জুতো এবং হাতে অপর জুতোটি ; এটি বাড়ীর সব লোক ছেড়ে শুধু মিসেস্ সেনের চোখেই ধরা পড়ে গেল, ভাগ্যিস, তাঁর চোখ এড়ালে হয়েছিল আর কি। ডক্টর সেনের কাছে কোন্ জুতোটার অস্তিত্ব যে লোপ পেয়েছিল তা বলা কঠিন, হয় হাতেরটার প্রতি খেয়াল আছে, পায়েরটার কথা মনে নেই কিম্বা Vice versa. যা হোক মিসেস্ সেন যখন হাত থেকে জুতোটা কেড়ে নিয়ে ডক্টর সেনের অন্য পায়ে পরিয়ে দিলেন তখন তাঁর হুঁস হলো।

মেটিরিয়া মেডিকা



আমাদের গ্রামের তিনকড়ি ডাক্তারের ভারি হাতযশ। ছেলেবেলা থেকে তাঁকে আমি একই ভাবে দেখে আসছি। মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উস্কখুস্ক চুল, অস্থিচর্ম্মসার শরীর, হাত-পা'র শিরাগুলি দূর থেকে দেখলে জোঁক লেগেছে বলে মনে হয়; কলে বেরুবার জন্য তাঁর সেই ঢলঢলে প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট আজন্ম রজকদর্শন বঞ্চিত আর তার সেলাইয়ের ভাজে, কলারের নীচে, পকেটের মধ্যে ছারপোকার আড়ৎ। এ হেন ডাক্তারবাবুর ডিস্পেন্সরীও তথৈবচ। ডাক্তারবাবু বিপত্নীক। হাটতলার কাছে ছোট্ট টিনের ঘরটিই তার ডিস্পেন্সরী, শয়ন কক্ষ, লাইব্রেরী সব কিছু। আসবাবের মধ্যে আছে একটা তিনপেয়ে বেঞ্চি, অর্থাৎ তার তিনটে পায়া কাঠের এবং চতুর্থটির নীচে চারটে ইট পর পর সাজান আছে। একটা বনাত ওঠা টেবিল, তার ওপর বেশি ভর দেওয়া বারণ। একটা ওষুধের আলমারি আছে, সেটা বয়সের ভারে এত ঝুঁকে

পড়েছে যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল। একটা তক্তপোশ আছে সেটা শুধু ডাক্তার বাবুরই ভার রাখতে পারে আর তার যে বালিস আছে সেটা নিংড়োলে ছটাক-খানেক তেল নিশ্চয় পাওয়া যেতে পারে। ডাক্তারবাবুকে ত' আর তেল কিনে মাথায় দিতে হয় না, সামনেই হারাধন মুদির দোকান, নাইতে যাবার সময় প্রতিদিনই হাতের তেলো ভর্ত্তি করে তেল চেয়ে নেন। শোনা যায় তিনকড়ি ডাক্তার কুড়ি পঁচিশ বছর



আগে কোলকাতায় একটা ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিলেন। হাতসাফাই করে সবরকম ওষুধ একটু একটু সরিয়ে একদিন নিজেও সরে প'ড়ে আমাদের গ্রামে গিয়ে ডাক্তারি সুরু করেন। ভিজিট্ ছিল

চার আনা থেকে আট আনা আর দূরের গ্রামে যেতে হলে পুরো একটা টাকা আদায় করে ছাড়তেন। আজকাল লড়াইয়ের বাজারে অবশ্য দু'টাকা ভিজিট করেছিলেন। তিনকড়ির তিনকুলে কেউ ছিল বলে শোনা যায় না, আর লোকে বলে ঘড়া ভর্ত্তি করে সিকি, আধুলি, টাকা, তাঁর তক্তোপোশের নীচে পোঁতা আছে। যাক্ সে খোঁজে আমাদের দরকার নেই। তবে ডাক্তারবাবুর হাতযশ যে আছে তা যে-কোন দিন সকালে তাঁর ডিস্পেন্সারীতে গেলেই বোঝা যায়; ইদানিং আবার শিশি হাতে লাইন দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল আর তাছাড়া আশপাশের গ্রামেও তাঁর পসার কম না। ডাক্তারবাবু ফোঁড়া কাটেন, ইঞ্জেকসন্ দেন আর শক্ত ব্যামোতে কয়েক দাগ ওষুধ দিয়ে, হয় এস্পার নয় ওস্পার করে তবে ছাড়েন।

আমি আর ললিত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম। আমি যাবতীয় চর্ম্মরোগে বিশেষজ্ঞ। প্রশ্ন হোতে পারে মানুষের শরীরে এত রকম রোগ থাকতে চর্ম্মরোগটা আমি বেছে নিলুম কেন। আর সাধারণতঃ চক্ষুরোগ, দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই দেখতে পাওয়া যায়, চর্ম্মরোগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ত' চোখে পড়ে না! তার কারণ কি জানেন? চুপি চুপি বলছি, কাউকে বলবেন না যেন, তা' হলে আমার পশার একদম মাটি হয়ে যাবে। আমার ডাক্তারিতে তিনটি মস্ত সুবিধা আছে। প্রথমতঃ আমার রোগীর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয় না, ফলে অসময়ে, রাত দুপুরে ডাকাডাকির বালাই নেই। দ্বিতীয়তঃ চর্ম্মোরোগে মানুষ কখনও মারা যায় না, সুতরাং সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। তৃতীয়তঃ আমার রোগী সাধারণতঃ সারে না অতএব আমার পশার কায়েমি। যাক্, আমার বন্ধু ললিত সেবার কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করলো, আমি তাকে পরামর্শ

দিলুম যে কলকাতায় ডাক্তারের ছড়াছড়ি বরং আমাদের গ্রামের কাছা-কাছির মধ্যে একটাও ভাল ডাক্তার নেই, সেখানে গিয়ে প্রাকটিস্ আরম্ভ কর তোরও সুবিধে হবে গ্রামের লোকও বাঁচবে। কথাটা ললিতের মনে খুব ধরে গেল।

তারপর একদিন মহাসমারোহে আমাদের গ্রামের হাটতলায় একেবারে তিনকড়ি ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীর সামনেই ললিত ডাক্তারের চেম্বার আধুনিকতম আসবাব আর ডাক্তারি সরঞ্জামে সাজিয়ে খোলা হ'ল। গ্রামসুদ্ধু লোক তটস্থ হয়ে পড়ল আর তিনকড়ি একটু শুধু হাসল।

মাসখানেক পরের কথা বলছি, দেশে গিয়েছি। একদিন সকালে ললিতের চেম্বারে গেলুম। দেখি ললিত বিমর্ষ বদনে একটা দামী সিল্কের সুট পরে রিভল্বিং চেয়ারটাতে বসে বসে সিগারেট ধ্বংস করছে। একটাও লোক নেই। এদিকে তিনকড়ির টিনের চালার নীচে লোক আর ধরে না। তিনকড়ি একটা আধপোড়া নেবান বিঁড়ি দাঁতে চেপে শিশি ভর্ত্তি করে করে ওষুধ দিচ্ছে। কোটের দু'পাশের পকেট সিকি, আধুলির ভারে ছিঁড়ে পড়বার মত হয়েছে। প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়া রোগী আর অধিকাংশের পেটে পিলে, মেয়েগুলোর কোলে ছেলে। ললিতকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি ললিত, এতদিনেও কিছু সুবিধা করতে পারলে না?"

ললিত বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, "ভ্যালা এক অজ পাড়াগাঁয়ে এনে ফেলেছ, যত আকাট মুখ্যুর বাস। একদিন বহুকষ্টে একটা ম্যালেরিয়া

রোগী ধরে এনেছিলুম। তাকে বিনামূল্যে এক শিশি কুইনিন মিকশ্চার দিলুম আর দোষের মধ্যে শুধু ভাত খেতে বারণ ক'রে সাবু খেতে বলেছিলুম। সে বেটা বিকেলে এসে কি বললে জান? বললে, "ডাক্তারবাবু—খিদেটা যে বড্ড জানান দেচ্ছে। ভাতের নাড়ি, ভাত না হলি টলে পড়ি। আজ মোটে খাটতি পের্‌তিছি নে যে?" আমি জিগ্যেস করলুম, "কেন সাবু খাওনি?" সে যা উত্তর দিল শুনে আমি নার্ভাস হয়ে গেলুম। সে বলল, "তা আর খাইনি, তিন পো সাবু রেঁধেছিলুম তাও পেটে থৈ পেল না।" আমি তাড়াতাড়ি তাকে বললুম, "তুমি তিনকড়ি ডাক্তারের কাছে যাও, আমি তোমার চিকিৎসা করতে পারব না।" তারপর গ্রামসুদ্ধ লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপে আমার সাতদিন চেম্বারে আসা বন্ধ ছিল।

বন্ধুর অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লুম। শেষে এক মতলব ঠাওরালুম। সেদিন সন্ধ্যের সময় তিনকড়িকে ললিতের চেম্বারে আমন্ত্রণ করলুম। তিনকড়ির হাতযশের অনেক সুখ্যাতি ক'রে, দামী সিগারেট খাইয়ে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেললুম ওর সঙ্গে, তারপর ললিতের বইয়ের শেলফ্ থেকে মেটিরিয়া-মেডিকা এনে তিন-কড়িকে দিয়ে বললুম, "ডাক্তারবাবু এই বইখানা ভাল করে পড়া দরকার আর তারপরে আরও কয়েকটা ভাল বই আছে যা না পড়লে আপনার ডাক্তারি বিদ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনকড়ি আনন্দের সঙ্গে এগুলি পড়তে সম্মত হ'ল। এর পর থেকে অবসর পেলেই তিনকড়ি মেটিরিয়া-মেডিকা পড়ত, গ্রেজ এ্যানাটমি পড়ত, আরও কয়েকটা ডাক্তারি বই শেষ করত আর মাঝে মাঝে ললিতের কাছে গিয়ে জটিল বিষয়গুলি বুঝে নিত। কিছুদিন পরে তিনকড়ির ডাক্তারিতে আমূল পরিবর্তন সুরু

হ'ল। প্রত্যেকটি রোগী ভাল করে পরীক্ষা করত, রোগের সমস্ত বিবরণ ভাল করে শুনতো, তারপর কি ওষুধ দেবে তা ভেবে কূল পেত না; কেবলই মনে পড়ত অমুক বইতে রোগের কোন অবস্থায়, কি লক্ষণে, কি কি ওষুধ দিতে বলেছে। সব কি রকম গুলিয়ে যেতে লাগলো, শেষে অনেক চিন্তা করে রোগীকে পাঠিয়ে দিত ললিতের কাছে। একটা ফোঁড়া কাটতে গেলে, কি ইনজেক্সন দিতে হলে, অমনি এ্যানাটমির পাতা-গুলি তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। দস্তুরমত ভেবে নিতে হ'ত কোথায় কোন্ হাড়ের জয়েণ্ট বাঁচিয়ে, কি কোন্ বিশেষ শিরা বাঁচিয়ে তাকে ছুরি চালাতে হবে কিম্বা ছুঁচ ফোটাতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করা হত না কেস্‌টা সিরিয়াস্ ভেবে পাঠিয়ে দিত ললিতের কাছে। কিছুদিন পরে তিনকড়ি আর একটা রোগীরও চিকিৎসা করতে পারত না; কেবলই তার মনে হ'ত ডাক্তারির সে কিছুই জানে না। অথচ এই তিনকড়িই অনেক মরণাপন্ন রোগীর প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে, রোগী না দেখেই ওষুধ দিয়ে কত রোগ সারিয়েছে। ছোট বড় ফোঁড়া সে চোখ বুঁজে কেটে দিয়েছে। পাঁচখানা গ্রামের লোক তাকে দেবতার মত ভক্তি করত। আর আজ তার এই দুরবস্থা কেন হ'ল? ভাঙা তক্তপোশটার ওপর শুয়ে শুয়ে তিনকড়ি শুধু ভাবত কেন সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে গেল।



সেদিন সন্ধ্যার সময় আমার গিন্নী আর বোন্‌কে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলুম থিয়েটার দেখে। কেন বলতে পারি না, আমি বরাবরই বাড়ীর মেয়েদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে নারাজ ছিলুম। যদিই বা কখনও অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউকে কোথাও নিয়ে যেতে হ'ত তা'হলে বলা কওয়া থাকত যে, সে আগে কিম্বা পেছনে বেশ দুরত্ব রেখে চলবে আর ট্রামে, বাসে কি সিনেমা হলে এমনভাব দেখাবে যেন আমাকে চেনেই না। এর ওপর আবার গিন্নী আমার এমনই গদাইলস্করী চালে হাঁটেন যে, ছেলে-বুড়ো সবারই নজর পড়ে যায় সে বেচারীর ওপর; তারপর এঁচোড়ে পাকা

ছোঁড়াগুলো যখন গা-জ্বালানো টিপ্পনী কাটে তখন আমার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়ে পড়ে। যাক্, সেদিন বড্ড বেশি ধরেছিল বলেই গিন্নী আর বোন্‌কে উপরের উল্লিখিত সর্ত্তে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছিলুম। কিন্তু বাড়ী ফিরবার পথে ঐ সর্ত্ত রক্ষা করতে গিয়ে এমন বিপদে পড়তে হ'ল যে তারপর থেকে ভবিষ্যতে 'পথে নারী বর্জ্জন' এই মহাবাক্য মেনে চলব সঙ্কল্প করেছি। পথে স্ত্রীলোক নিয়ে যে কত ফ্যাসাদেই পড়তে হয়, এবং আজ পর্য্যন্ত কত রকমের দুর্ঘটনাই যে ঘটছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আবার বাঙ্গালী মেয়েদের বেলা কথায় বলে যে, স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে যদি ট্রেনে ভ্রমণ করতে হয়, তা'হলে দশটা পুঁটলি থাকলে এগারটা গুণতে হবে। অবশ্য আধুনিক স্কুল-কলেজে পড়া, কি চাকুরিজীবী শহুরে মেয়েদের বেলা এ মন্তব্য খাটবে না—এমন কি আমার হেড মাষ্টারণী মার্কা গিন্নীর বেলাও খাটবে না। তবে কথাটা হচ্ছে যে, আজকাল পথে-ঘাটে মেয়েদের একা ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না। ব্রিষ্টল হোটেলের সামনে দিয়ে চলবার সময় আজও বাঙ্গালী মেয়েদের মনে আতঙ্কের শিহরণ জেগে ওঠে। পরাধীন জাত বলেই না আজ আমরা আমাদের মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করবার শক্তিটুকুও হারাতে বসেছি। আইনের কথা তুল্‌লে বলতে হয়, 'শ্বেতাঙ্গের বেলা লীলা-খেলা আর অপরাধ হয় কালা-আদমীর বেলা'। চুলোয় যাক্‌গে ওসব কথা,—বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—এক গিন্নীতেই অস্থির, দেশের মেয়ের দুরবস্থার কথা ভাবি কখন? তারপর ট্রামে ত' বেজায় ভিড়। লেডিস্ সীটে আমার স্ত্রী ও বোন এমনভাবে বসে আছে যেন তাদের সঙ্গে অন্য তৃতীয় ব্যক্তি আছে বলে মনেই হয় না। আমি ভিড়ের চাপে এককোণে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। এস্‌প্ল্যানেডের কাছাকাছি একটু ভিড়

কমতে তখন লক্ষ্য করলাম যে, লেডিজ সীটের প্রতি দু'টি ছোক্রার মনোযোগ একটু গভীরভাবেই রয়েছে। বোধ হয় নিজেদের টিকিটের পয়সা দেওয়া থেকেই অভিনিবিষ্ট ছোক্‌রা দু'টির দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে মহিলা দু'টি 'একাই' চলেছেন। ট্রাম এস্‌প্ল্যানেডে আসতেই আমার স্ত্রী ও বোন ট্রাম থেকে নেমে পড়ল, এবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওদের পেছনে পেছনে নেমে পড়লুম। ছোক্‌রা দুটো যেন আমার অমনভাবে বেয়াদপের মত নামাটা মোটেই বরদাস্ত করতে পারল না। তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে আমার পিছু নিল। আমাকে গুণ্ডা-টুণ্ডা ঠাউরেছে দেখে মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলুম। গিন্নী কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি; দিব্যি গল্প করতে করতে গদাই-লস্করী চালে হেঁটে চলেছে এবং আমি যখনই তাদের প্রায় গায়ের কাছে এসে পড়ছি, অবশ্য ইচ্ছে করেই, তখনই তারা আমার পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাড়াতাড়ি জোরে পা চালিয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে। ফলে ছোঁড়া দুটোর সন্দেহ ক্রমে বেড়েই যেতে লাগল। যখন তাদের হাবভাবে বুঝলুম যে তারা আমাকে একটা পাকা বদ্‌মায়েস বলেই স্থির করেছে, তখন কেন জানি মরতে আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। আমি একটু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আশেপাশে একটু লোকজন কম দেখে খপ করে আমার স্ত্রীর একটা হাত ধরে ফেললুম। প্রকাশ্য রাজপথে আমার এই আচরণ গিন্নীর কল্পনাতীত ছিল। সে হঠাৎ চম্‌কে উঠে আমাকে ভাল করে দেখে নিল, তারপর ইঙ্গিতে তার পাশে আমার বোন রয়েছে জানিয়ে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। আমি ছোঁড়া দুটো কি করছে দেখব ভাবছি, কিন্তু ভাববার সময় পেলুম না; 'ইউ রাস্কেল' এই চীৎকারের সঙ্গে পিঠে দুম্ করে

একটা ভাদ্দুরে তাল পড়ল। আচম্‌কা কিল খেয়ে হঠাৎ মুখ থেকে কথা বেরুল না, শুধু একটা কাতরোক্তি "উঃ" শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা গাঁট্টা খেয়ে মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল, অস্পষ্ট



শুন্‌তে পেলুম, "ব্যাটা বদমায়েসি করবার জায়গা পাস্‌নি, ভদ্রলোকের মেয়ের হাত ধরতে যাস্—মগেরমুল্লুক পেয়েছিস্ আর কি—এ্যা, আবার ধুতি, পাঞ্জাবী, চশমা লাগিয়ে ভদ্রলোক সাজা হয়েছে। উল্লুক, শয়তান, লক্ষীছাড়া, পাজী, বেল্লিক, বেয়াদব, বেহুঁশ, বেতমিজ, বে-আক্কেল, বেহায়া—মজাটা দেখাচ্ছি দাঁড়া।" গিন্নী এ বিপদে আমকে রক্ষা না করলে মজাটা পুরোপুরিই দেখতে হ'ত; যা দেখেছি তারই গুঁতোয় অস্থির। চারিদিকে

লোক জমা হয়ে আমার অবস্থা চরমে পৌঁছে দিল। কেউ বলে, "শালাকে লাগাও মার্।" আবার কেউ বলে, "বেটাকে পুলিসে দাও।" বহু কষ্টে সেই ক্রুদ্ধ জনতাকে বোঝাতে পেরেছিলুম যে ঐ মহিলা দু'টি আমার বিবাহিতা স্ত্রী ও সহোদরা বোন।" শিভালরাস্ ছোকরা দু'টি হাত জোড় করে বললে, "কিছু মনে করবেন না স্যার্, আমাদের একটু বুঝবার ভুল হয়েছিল।" মার খেয়ে বাড়ী ফিরে কান মলেছি আর কোনদিন মেয়েদের নিয়ে পথে পা দেব না।



বিড়ির ঘুন্ষি পার হয়ে গেল, তবু টানের বিরাম নেই। গৌরীপুর প্রাইমারী স্কুলের হেড মাষ্টার যতীনবাবু শীতে হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ছুটেছেন স্কুলের পথে। আজ ক্লাস প্রোমশন, বিস্তর কাজ। ক'সে বিড়িতে টান দিয়েই চলেছেন ; পয়সা দিয়ে কেনা, কিছুই ছাড়া হবে না, আঙ্গুলে ছ্যাঁকা লাগলে তখন একটা সুখটান দিয়ে তবে ফেলা যাবে। ওদিকে কাসিতে প্রাণ বেরুবার যোগাড়। একটা করে টান মারছেন

আর চোখের জলে নাকের জলে হচ্ছেন। গলার শিরা ফুলে উঁচু হয়েছে, নাকের ডগা, কান, লাল হয়ে গিয়েছে, তবু বিড়িটার মায়া ছাড়তে পারছেন না। মিত্তির মশাই দাওয়ায় বসে তামাকু সেবা করছিলেন। হেড মাষ্টারকে অত সকালে হন্ হন্ করে ছুটতে দেখে ডাক দিলেন, "বলি ও চক্কোত্তি মশাই, আজ এত সকালে যে? ক্লাস প্রোমশন বুঝি? তা শুনুন শুনুন আমার ঐ ভাগনেটার একটা যা হোক কিছু—"

হেড মাষ্টার রুখে উঠে বললেন, "সারা বছরটা ফাঁকি দিলে এখন কি আর 'যা হোক কিছু' হয়?"

মিত্তির মশাই হেসে বললেন, "হ্যাঁ, তা তো হয় না; যাক্ সে কথা, বলছিলুম কি সেদিন যোগেশদা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আপনার মাইনে বাড়ানোর প্রস্তাবটা আমি কমিটির মিটিংএ সমর্থন করব কি না।"

এখানে বলে রাখা ভালো যে যোগেশদা হলেন স্কুল কমিটির সেক্রেটারী, আর মিত্তির মশাই একজন মেম্বর। কথাটা শুনেই চক্কোত্তি মশাই ঘুরে দাঁড়ালেন, সোজা দাওয়ায় উঠে মিত্তির মশায়ের একটা হাত চেপে ধরে বললেন, "দোহাই মিত্তির মশাই, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে আমার দরখাস্তটা মিটিংএ পেশ করা গেছে, এই দুর্দ্দিনের বাজারে বুঝতেই ত' পারছেন পঁচিশ টাকায় একটা ছাঁপোষা লোকের কি করে চলতে পারে। ওটা আপনাদের করে দিতেই হবে। নিজের দেশ ছেড়ে ভিন্ গাঁয়ে পড়ে আছি, আপনারা যদি না দেখবেন ত' কে দেখবে? আচ্ছা যাই তা'হলে, বড্ড দেরি হয়ে গেল। আর ভালো কথা, আপনার ভাগনেকে পাঠিয়ে দিন, দেখি কি করতে পারি।"

মিত্তিরদের বাগানটা পেরুতে না পেরুতে ঘোষেদের ছেলে মণ্টু ধরে

বসল—"মাষ্টার মশাই মা বলছিলেন দুধ দিয়ে নলেন পাটালি তৈরি করছেন, কিছু দিয়ে আসব আপনার বাড়ীতে? আর আধ সেরটাক্ ঘরের তৈরী টাট্‌কা ঘি নিয়ে যাব? গরম ভাতে খেতে ভারী ভাল লাগে।"



মাষ্টার মশাই ঢোঁক গিলে বললেন, "এ্যা, তোর মা বলেছে বল্‌লিনে? তা যখন অত করে বলেছে দিয়ে আসিস্। তা তুই স্কুলে যাবি না, আজ ক্লাস প্রোমশন জানিস্ ত'?"

মণ্টু মুখটা কালো করে বললে, "তা তো জানি স্যর, কিন্তু ফেল হয়েছি বলে মা বলছিলেন আমার আর গিয়ে কাজ নেই।"

হেড মাষ্টার বেগতিক দেখে বললেন, "আবার ফেল করে বসেছিস্? নাঃ জ্বালালে দেখছি। তা যাস্ স্কুলে দেব'খন পাশ করিয়ে। আর ত্থাখ ঐ ঘি তুই এক সের নিয়ে যাস; আজ আবার জামাই আসছে, কোথায় এখন ঘি খুঁজব। তুই ঘিটা আমার বাড়ীতে রেখে চট্ করে স্কুলে চলে আয়। যা, যা দেরি করিসনি।" আর খানিকটা এগোতেই দেখতে পেলেন দূরে বট্‌তলার পুকুরধার দিয়ে এইদিকেই আসছে মুন্সি-পাড়ার দুষ্টু ছেলে আলিম। মাথায় তার মস্ত এক ঝুড়ি, তাতে দেখা যাচ্ছেঃ পাকা কলা, ফুলকপি, একটা দশসেরি রুই আরো কত কি! হেড মাষ্টার চোখ দুটো আমড়ার মত করে আর পোকায় খাওয়া কালো দাঁত বত্রিশপাটি বার করে বললেন, "কিরে, এ-সময়ে স্কুলে না গিয়ে ওসব নিয়ে এ-দিকে কোথায় যাচ্ছিস?" আলিম একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলল, "ফেল করে স্কুলে যেতে লজ্জা করে স্যার, তাই আজ আর যাবো না। আর তাছাড়া বাগানের তরিতরকারি, পুকুরের মাছ, এই সব নিয়ে আপনাদের ওদিকে আবার যেতে হচ্ছে।" হেড মাষ্টার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা, ওগুলো পৌঁছে দিয়ে তুই স্কুলে আয়, পাশ করিয়ে দেব'খন কিন্তু আসছে বছরে ভাল করে পড়াশুনা করা চাই বুঝলি?"

স্কুলে বাস্তবিকই অনেক কাজ। অধিকাংশ ফেল করা ছাত্রদের অভিভাবক স্কুলে এসেছেন। কাজকর্ম্ম শেষ করে স্কুলের ছুটি দিয়ে হেড মাষ্টার বাড়ী ফিরলেন। নলেন পাটালি আর পোটাকখানেক ঘি বাড়ীতে পৌঁচেছে। হেড মাষ্টার গৃহিণীকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘি এক সেরের জায়গায় একপো দিল কেন?" গৃহিণী তাঁর বিশাল বপুখানি

ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমি তার কি জানি বাপু, ছোঁড়াটা বললে বাড়ীতে যা তৈরি ছিল সব নিয়ে এসেছে। যাও এখন হাটখোলায়, ঘি-র জোগাড় দেখগে। তোমার জামাইয়ের ত' আবার অম্বল, গাওয়া ঘি না হলে মুখে রুচবে না।" হেড মাষ্টার মহাখাপ্পা হয়ে বললেন, "বটে, মোণ্টেটা আমাকে ঠকালে? আচ্ছা, ঘোষের পো যাবে কোথায়? যাক ঘি-র ব্যবস্থা করে দিচ্ছি; মাছটা বাছাকোটা হয়ে গেছে না কি?" গৃহিণী চোখ কপালে তুলে গালে দুটো আঙ্গুল রেখে বললেন, "ওমা, মাছ আবার কোথায় দেখলে? নেশা করে এসেছ নাকি?" হেড মাষ্টার রাগে ফেটে পড়লেন, "কেন, আলিম ছোঁড়াটা দিয়ে যায়নি? মাছ, ফুলকপি—মর্ত্তমান কলা—?" গৃহিণীও যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, "দিয়ে গেলে আমি কি তা পেটের মধ্যে রেখেছি? এ কি জ্বালায় পড়লুম গা!" খানিক ভেবে নিয়ে গৃহিণী আবার বললেন, "তবে হ্যাঁ সকালের দিকে আলিমকে যেন দেখেছি একটা খালি ঝুড়ি হাতে। বললে, তার পিসীর বাড়ী গেছল, ঐ যে কাঁটাল গাছটার একটু আগে আটচালার ঘর দেখা যাচ্ছে ঐটে ওর পিসীর বাড়ী।" তক্তপোশের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হেড মাষ্টার শুধু বললেন, "ওঃ।"



সরকারী কাজে গত সপ্তাহে মাত্র তিন দিনের জন্যে দার্জ্জিলিং যাবার হুকুম পাই। চাকরি যখন করি তখন হুকুম মানতেই হবে। গিন্নী মুখ কালো করে বসলেন, কেন না আমি নাকি কবে তাঁকে কথা দিয়েছি যে এবারে দার্জ্জিলিং গেলে নিশ্চয়ই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সাত পাঁচ অজুহাত দেখিয়ে কোন রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে দার্জ্জিলিংএর পথে বেরিয়ে পড়লুম।

হয়ত সবাই মনে করছেন আমি ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়, পথে যেতে একটা সামান্য ঘটনার কথাই বলতে যাচ্ছি। ভ্রমণটা ট্রেনে বলেই গোড়ার দিকে বাঁধি গৎ এড়ান যাচ্ছে না।

তারপর যা বলছিলুম, ট্রেনে ত' যথারীতি দারুণ ভিড়। দাঁড়াবার স্থান আছে বটে, কিন্তু বসবার স্থান একটুও নাই। কামরাটার ভেতর ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম এককোণে এক দাড়ীওয়ালা বুড়ো ভদ্রলোক যেন একটু বেশি জায়গা দখল করে বসে আছেন, কিন্তু গোল বাঁধিয়েছে বুড়োর সঙ্গের সুন্দরী তরুণীটি, পরে কথাবার্ত্তায় টের পেলুম ওটি তাঁর কন্যা। বাঙ্কের ওপর মোটঘাটে ভর্ত্তি, আবার কেউ শোবার জন্য জায়গা

পেতে রেখেছে, কেউবা শুয়েও পড়েছে। বুড়োও তার মাথার ওপর বাঙ্কে বিছানা করে রেখেছেন। বসবার জায়গা আশ্চর্য্যরকম উপায়ে হয়ে গেল, কেন না বুড়ো এবং তাঁর কন্যার পাশের ভদ্রলোকটি রাণাঘাটের যাত্রী। আমি ঠিক তাক্ করেই তাদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলুম, রাণাঘাটে যাত্রীটি উঠলেই বসে পড়তে হবে।

ট্রেন ছাড়ল। ভরতি গাড়ীর মধ্যে একটু হাওয়া খেলতেই আমরাও আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। রাণাঘাট পেরিয়ে গেল। আমি পাশের সুন্দরীটির দিকে যদিও অসভ্যের মত চেয়েছিলুম না তবুও আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিলুম। মেয়েটি ভারী চঞ্চল। অনর্গল তার বাবার সঙ্গে বকে যাচ্ছে আর একবার সুটকেস খুলছে, একবার ওখানকার জিনিষ এখানে রাখছে, যেন গোছান আর কিছুতেই শেষ হয় না।

টিফিন-কেরিয়ার খুলে বৃদ্ধ এবং তাঁর কন্যা নৈশ আহার শেষ করলেন। খানিক পরে দেখলুম বুড়ো যেন বেশি রকম উস্‌খুস্ করছেন, মেয়েটি তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছে। বুড়ার ছটফটানি ও মেয়েটির খোঁজার বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে লাগল। কি যে হ'ল কিছুই বোঝা গেল না। আগে যে বৃদ্ধের মুখে অমায়িক হাসি লেগেছিল, সে মুখে বিরক্তি এবং ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল। বুড়া দাঁতে দাঁত চেপে বিড় বিড় করে বলছেন, "পই পই করে বললুম ভাল করে মিলিয়ে দেখে নে সব জিনিষ নেওয়া হ'ল কিনা, তখন কিনা বলা হ'ল আর দেখতে হবে না সব ঠিক আছে, এখন আমি কি করি বল দিকি?" মেয়েটির মুখ দেখে মনে হ'ল সে যেন বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে এবং যতই তার বাবার রাগ বাড়তে লাগল ততই সে মাটিতে মিশিয়ে যেতে লাগল।

তার অবস্থা দেখে আমি আর থাকতে পারলুম না, আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনারা কি ফেলে এসেছেন জানতে পারি কি, যা এখনই না হলে চলছে না।"

মেয়েটি কথা শুনেই আমার মুখের দিকে তাকাল যেন এই প্রথম দেখল আমি একজন তার পাশে বসে আছি। তারপর মাথাটা নীচু করে, ব্যথিত কণ্ঠে জবাব দিল, "আফিংএর কৌটো।"

ও হরি, এই ব্যাপার! আমি মেয়েটিকে সহজভাবেই বললুম, "তা এর জন্য এত ভাবনা কিসের? কোল্‌কাতা ছাড়া কি আর কোথাও আফিং পাওয়া যায় না নাকি? দার্জ্জিলিং পৌঁছে কালই আপনাদের আফিংএর দোকান দেখিয়ে দেব'খন।" মেয়েটি আশার আলো দেখতে পেয়ে আনন্দের সঙ্গে তার বাবাকে জানাল যে ভাবনার কারণ নেই, আফিং কালই পাওয়া যাবে। বুড়া ত' রেগেই আগুন, মুখ ভেংচে বললেন, "কাল পাওয়া যাবে ত' আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। আরে, এখন আমার কি উপায় হবে তাই বল্! এখুনি একটু পেটে না পড়লে শ্রেফ মরে যাব। সারারাত ঘুমুতেই পারব না, মাথা ধরবে, পেট ফুলবে, উঃ কি যে করি আমি।" যতই সময় যায় ততই বৃদ্ধ গাড়ীসুদ্ধ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, চুল দাড়ী ছিঁড়ে, এক বীভৎস কাণ্ড আরম্ভ করলেন। মেয়েটি ত' লজ্জায় মুখ লুকবার পথ পায় না। তাঁদের অবস্থা দেখে আমার ভারী দুঃখ হতে লাগল, কিন্তু কিছুই করবার নেই তাই আমি জানলার বাইরে মুখ বার করে দিয়ে অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলুম।

মুস্কিলের আসান অভাবনীয় রকমে হ'ল। গাড়ীর আর এককোণে এক আফিংখোর ভদ্রলোক ছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর নজরে পড়তেই

তিনি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "ও মশাই, বলি শুনছেন, এই যে এই দিকে আমার কাছে আসুন ত', আপনার যা চাই কাজ চালাবার মত এখন দিয়ে দিচ্ছি, উঠে আসুন এদিকে।" আফিংখোর মানুষ অনেকক্ষণ নেশা পেয়েছে, কোণের ভদ্রলোকের ডাক শুনেই, হন্তদন্ত হয়ে একরকম লোকজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে গেলেন। কোণের ভদ্রলোক কৌটা বার করে দুই হাঁটুর মাঝখান দিয়ে লম্বা শির ওঠা গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,



"মশাইয়ের কতটা করে লাগে?" বুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে আমড়ার মত চোখ বার করে বললেন, "আজ্ঞে বেশি না দু' আনি ভোর হলেই হয়ে যাবে।" ভদ্রলোক চম্‌কে উঠে বললেন, "এ্যাঁ দু' আনি ভোর বেশি না? বলেন কি মশাই? তা'ম ত' মৌরি-প্রমাণেই ঝিমুতে আরম্ভ করি,

তা যাকগে এই নিন মটর-প্রমাণ দিলুম, এই আপাততঃ গলায় ফেলে আজকের মত শুয়ে পড়ুন।" বুড়ো ত' আনন্দে গদ্ গদ্ হয়ে মটর-প্রমাণ আফিং দুই আনাকে গোল করতে করতে নিজের জায়গায় ফিরে এসে কুঁজো থেকে জল এক গেলাস ঢেলে নিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চোখ বন্ধ করে বড়িটা টুক্ করে গালে ফেলে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বাঙ্কের ওপর উঠে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়লেন।

পার্ব্বতীপুরে সকাল হ'ল। বুড়ো ভদ্রলোক দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছেন, ট্রেনের মধ্যে অমন তোফা ঘুম মানুষ যে কি করে দিতে পারে আমি ভেবে পাই না। সকাল হতেই বৃদ্ধ বাঙ্ক থেকে নামলেন। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে মুখ হাত ধুলেন, কিন্তু এইখানেই ঘটল আর এক বিপত্তি। বুড়া তাঁর ভিজে হাত দিয়ে দাড়িটা মুছতে গিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল হাতে যেন কি ঠেকল। আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে সেই পদার্থটা বার করে চোখের সামনে ধরেই বুড়ো লাফিয়ে উঠলেন, "ওরে খুকি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমি আর বাঁচব না, চোখে অন্ধকার দেখছি, বুক ধড়পড় করছে, পেট ভুট-ভাট করছে, সারারাত যদি একটু ঘুমুতে পেরেছি। আমরা দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে বৃদ্ধের কাছে ছুটে গেলুম, মেয়েটি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা তোমার কি হয়েছে?" বুড়া কপাল চাপড়ে বললেন, "আর কি হবে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে,—এই ছাখ সে আফিং আমি কাল খাইনি, দাড়িতে আটকে গিয়েছিল।" ও হরি এই ব্যাপার! আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না।



বসন্ত ছেলেটাকে সবাই ভাল বলেই জানে। ম্যাট্রিক পাশ করেই লড়াইয়ের বাজারে সাপ্লাই অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। বাড়ী তার শ্রীরামপুর। সংসারে আছে তার বৃদ্ধ বাপ, মা, আর আছে 'ওগো'। কলিকালের ছেলে হয়েও বুড়ো বাপ-মার দেখা শোনা করে বলে সবাই তার সুখ্যাতি করত। ইদানিং তার স্বভাবটা একটু খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছিল। কারণ শ্রীরামপুর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করা আজকালকার দিনে সোজা কথা নয়। অফিস টাইমে সামান্য ট্রামে উঠতেই আমরা হিম্‌ সিম্‌ খেয়ে যাই, আর এত টাইমবাঁধা ট্রেন তাও আবার একখানা বই দু'খানা নেই। তার ওপর ভিড়ের মধ্যে আজ পকেট থেকে মনিব্যাগ উধাও হচ্ছে, কাল রেশনের থলে চলে যাচ্ছে, আর ইলিশ মাছ কি বাঁধাকপি নিয়ে ট্রেনে উঠলে সেদিন নির্ঘাৎ কেউ না কেউ ভুল করে তা নামিয়ে নিয়ে যাবেই। তা ছাড়া অফিসের বড়বাবুটাও তেমনি; পাঁচটার সময় ছুটি কিছুতেই দেবে না। সেদিন মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখবে বলে টাইপিষ্ট সুধীর গিয়েছিল বড়বাবুর কাছে ছুটি চাইতে চারটার সময়। তিনি তখন কি একটা ফাইল দেখছিলেন। সুধীরকে দেখেই আরো মনোযোগ সহকারে ফাইলটা দেখতে লাগলেন। সুধীরের ছুটির প্রার্থনা তাঁর কানে গেল কি না কে জানে? তবে ভাব

দেখে মনে হলো যে কানের কাছে যদি দশটা সাইরেন বাজে তাও বোধ হয় তিনি শুনতে পাবেন না। অনেকক্ষণ পর বড়বাবু চোখ তুললেন। চশমার পাশ দিয়ে সুধীরকে একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, কিছু বলছ নাকি?" সুধীর আম্‌তা আম্‌তা করে তার প্রার্থনাটার পুনরাবৃত্তি করল। বড়বাবু গোঁফের পাশ দিয়ে ছটাক খানেক হাসি ছেড়ে বললেন, "খেলা?" বলেই ফাইলে মনোনিবেশ করলেন। সুধীর প্রাণে আশার সঞ্চার করে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু।" কিন্তু হায়, বড়বাবু ততক্ষণে ধ্যানস্থ, কিছুই কানে পৌঁছল না। আবার কিছুক্ষণ পরে ধ্যানভঙ্গ হলে পুনরায় সুধীর তার আর্জ্জি পেষ করল। এবার বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাদের খেলা?" কিন্তু উত্তর শুনবার আগেই তিনি ফাইলের মধ্যে ডুব মারলেন। সুধীরের মনের অবস্থা যে তখন কি তা মসীজীবী মাত্রেই অনুমান করতে পারেন। যা হোক্ এমনি ধরণের "কি খেলা?" "কোথায় হবে?" "কবে হবে?" "তুমি যাবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন একে একে শেষ করে ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা পর যখন বড়বাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা—যাও" ওদিকে তখন খেলা শেষ। এহেন বড়বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বসন্তের কোনদিনই লাষ্ট ট্রেনের আগে বাড়ী যাওয়া হতো না। তাই তার মেজাজটা ক্রমে ক্রমে হয়ে পড়েছিল তিরিক্ষি।

সেদিন ছিল রোববার। রাখালটা 'ফ্রেঞ্চলীভ' নিয়ে বসে আছে। অগত্যা গোয়ালের গরুগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে, সংসারের আর সব প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে বসন্ত যখন বাড়ী ফিরল তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। এখানে একটু বলে রাখি যে বসন্ত পাঠ্যাবস্থায় সংসারের কুটোটি পর্য্যন্ত নাড়ত না। হাট-বাজার করতে কিম্বা মুদির দোকান

থেকে এক বোতল তেল আনতে তার ভারী লজ্জা করত। কিন্তু এখন ? গরজ বড় বালাই! যাক্ রোদে ঘুরে ঘুরে বসন্তের মেজাজ তখন climax-এ পৌঁছে গেছে। বাড়ীর ভেতর পা দিয়েই দেখে ঘরের দাওয়ায় খানিকটা তামাকের গুল পড়ে রয়েছে। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে এক্সপ্লোশন আরম্ভ হয়ে গেল, যেন বম্বের ডক্! "কে এখানে তামাক খেয়ে গুল ফেলে রেখেছে? কে সেই নবাব পুত্তুর? জবাব পাচ্ছিনা কেন? আজ আমি দেখে নেব তাকে, তারই একদিন কি আমারই একদিন", ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘরের ভেতর থেকে বুড়ো বাপ কাশতে কাশতে বেরিয়ে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ওরে খোকা, আমি তামাক খেয়ে গুল ফেলে রেখেছি; এক্ষুণি পরিষ্কার করে দিচ্ছি, রাগ করিসনে বাবা।" তখনই ঝাঁটা নিয়ে গুল পরিষ্কার করতে বসন্তের বাপ লেগে গেল। বসন্ত গজর গজর করতে করতে বাড়ীর মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল, দেখে উঠানের ওপর খানিকটা পানের পিক্ পড়ে আছে; অমনি টাইম্ বম্ব-এর মত ফেটে পড়ল, "আবার এখানে খানিকটা পিক্ ফেলেছে কে? নাঃ, আর পারি না, আমাকে সবাই মিলে ঘর-ছাড়া করে তবে ছাড়বে। যা দেখতে পারি না, তাই আমার চোখের সামনে। যত নোংরার দল আমার বাড়ী জুটেছে…।" খিড়কির পুকুর থেকে বৃদ্ধা মা ছুটে এসে বলল, "ও বাবা, আমি মরতে পান খেয়েছিলুম, তুই ঘরে ওঠ্ লক্ষ্মী, মাণিক আমার, আমি ঐ যায়গাটা খুব ভাল করে নিকিয়ে দিচ্ছি।" তারপর কাঁপতে কাঁপতে খানিকটা গোবরমাটি গুলে যায়গাটা ভাল করে নেপে মুছে নিল। বসন্ত রাগে ফুলতে ফুলতে ঘরে উঠছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ল ধানের গোলার ওপর একটা ঝাঁটা। ব্যস্, বেধে গেল তুমুল প্রলয়কাণ্ড। বসন্তের তখনকার মূর্ত্তি কালবৈশাখীর আকার ধারণ

করেছিল। তার সেই হাতপা ছোঁড়া আর গলাবাজি শুধু কল্পনা করাই চলে, বর্ণনা চলে না, অন্ততঃ আমার দ্বারা তা' সম্ভব নয়। সে যখন চেঁচাচ্ছিল, "বলি, গোলার ওপর ঝাঁটা রেখেছে কে? এ্যা কোন লক্ষ্মী-



ছাড়ার কাজ এটা? আমার ঘরে আলক্ষ্মী ডেকে আনে কে? আজ আমি তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব…।" তখন হেঁসেল থেকে তার নব-পরিণীতা 'ওগো' বেরিয়ে এসে কাংস্যবিনিন্দিত সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,

"এসো না দেখি, কে কাকে ঝেঁটোয় ? কখন মনের ভুলে ঝাঁটাটা ওখানে রেখেছি আর তারই জন্য কিনা তিড়িং বিড়িং করে নাচতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মিন্সের আক্কেল দেখ না ; বলি ওনার সংসারে খেটে খেটে আমার গতরে ঝাঁঝরা পড়ে গেল আর উনি এসেছেন কথা শোনাতে।" মুহূর্তের মধ্যে ঝড় থেমে গেল। এক গাল হেসে বসন্ত বলল, "ও তুমি, তুমি রেখেছ, আচ্ছা থাক থাক আমি ওটা সরিয়ে রাখছি ; তাতে আর হয়েছে কি, অমন ভুল হয়েই থাকে।"



আঙ্গুলহাড়ায় ক'দিন থেকে বড় কষ্ট পাচ্ছিলুম ! সে যে কি যন্ত্রণা তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। যাঁর হয়েছে তিনিই জানেন, আর যাঁর হয়নি তাঁর যখন হবে তখন তিনি বুঝতে পারবেন যন্ত্রণাটা কি রকম, আর আমি কি কষ্টই না পাচ্ছিলুম। আমাদের অফিসের পশুপতিবাবু আবার হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার। তিনি বলে দিলেন, "এক ডোজ আর্সেনিক 'টু হাণ্ড্রেড' খেয়ে নাও, ওটা আপনিই ফেটে যাবে।" বাড়ী ফিরে খেয়ে নিলুম এক ডোজ আর্সেনিক 'টু হাণ্ড্রেড'। করিম চাচা দেখে শুনে বললেন, "আঙ্গুলহাড়ার জন্য চাঁদসীর মলমের মত আর কোন ওষুধই হয় না ; একবার লাগালেই হয় বসে যাবে নয় ফেটে যাবে।" চাঁদসীর মলম সহজেই পাওয়া গেল। চাচি বললেন, "কালে কালে কতই যে দেখব। আমরা ত' বাপু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি আঙ্গুলহাড়া হলে একটা কচি বেগুনের ভেতরটা কুরে আঙ্গুলের ওপর বসিয়ে দিলেই রাতারাতি সেরে যায়।" চাচির অভিজ্ঞতাটাও মনে ধরে গেল ; কারণ উপায় যে নেই, যে ভয়ানক যন্ত্রণা ! মিয়াভাই বললেন, "বোরিক্ কম্প্রেস কর্ না, যন্ত্রণাটা এখুনি কমে যাবে।" বড় ভাইয়ের কথাও ফেললুম না। এদিকে আমাদের সরকারি রমেশ ঠাকুদ্দার অযাচিত উপদেশ না মেনে চললে যদি একটা কিছু হয়ে পড়ে ত' একেবারে রুখে এসে বলবেন, "বুড়োর কথাটা ত' তখন কানে গেল না এখন সামলাও ঠ্যালা ? আজকালকার সব

এঁচোড়ে পাকা ছোঁড়া, দু'পাতা ইংরেজী পড়ে মনে করে কি হনুরে।" সুতরাং তাঁর উপদেশ মত যথাক্রমে তারিণী কোবরেজের এক পুরিয়া 'বজ্রচূর্ণ' খেয়ে ফেললুম। আমাদের বাড়ীতে যে মৌলুভী সাহেব আছেন তিনি আবার নোয়াখালির 'ইয়ে'! মগরেবের নামাজ পড়ে এসে আমার বুড়ো আঙ্গুলটায় দরুদ পড়ে তিনবার ফুঁ দিয়ে তিনি বললেন, "ইন্‌শাল্লা হেতেই আরাম অইব, আর ঐ হকল নাপাক্ জিনিষ লাগায়স্ না। কিছু তেল পইরা দিবনি, লাগাইলে এ্যক্কেরে সাইরা যাবে।" মৌলুভী সাহেবের অবাধ্য হওয়া অসম্ভব, তা'হলে বাড়ীতে আমায় আস্ত রাখবে না। কিন্তু হায়, কিছুতেই কিছু হ'ল না। পরদিন সকালে সহপাঠী গোপেন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। আমার দুরবস্থা দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, "কোথাকার আহাম্মুখ রে তুই? লেখাপড়া শিখেছিস্ আর এটা তোর ঘটে এলো না যে, তোর উচিত ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া? তা না করে যে যা বলছে তাই শুনে যাচ্ছিস্? একেবারে 'চিকিৎসা বিভ্রাট' করে তবে ছাড়বি? চল আমার সঙ্গে এক্ষুণি শচীন ডাক্তারের কাছে।" অকূলপাথারে যেন কূল পেলুম। মনে মনে গোপেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। ঘণ্টা দেড়েক ডাক্তারখানায় ধন্না দেবার পর আমার পালা এলো।

ডাক্তারবাবু আমার আঙ্গুলটা বেশ করে টিপে টুপে যন্ত্রণাটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এ কিছু না, একটু ওপন্ করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।" ওপন্ করার নাম শুনে অসহায়ের মত গোপেনের মুখের দিকে চাইলুম। গোপেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হেসে বলল, "ভয় কিরে, নে না একটু মুখটা কেটে, টেরও পাবি না।" অস্ত্রচালনার কথা ভাবতেই আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। গোপেনকে বললুম, অঙ্গুলহাড়ার

যন্ত্রণায় যদি মরেও যাই সেও ভি আচ্ছা, তা' বলে ওসব ওপন-টোপনে আমি রাজি নই।" গোপেন কি একটা ভেবে নিয়ে বললে "বেশ তরে চল্ এখান থেকে। কিন্তু ফিরবার পথে তোর আহাম্মদ মামারবাড়ী একবার হয়ে যাব। আহাম্মদ মামার নাম শুনে আবার ঘাবড়ে গেলুম। তিনি পেন্-নাইফ, নরুন প্রভৃতি দিয়ে ফোঁড়া কাটতে সিদ্ধহস্ত। তাঁকে দেখলেই আমার কেমন যেন ভয় করে। সেইজন্য গোড়াতেই গোপেনকে জিজ্ঞাসা করলুম—হঠাৎ আহাম্মদ মামার ওখানে কেন রে? কোন মতলব-টৎলব আছে নাকি? আমি আগেই কিন্তু বলে রাখছি ওসব কাটা-কুটিতে আমি একদম নেই। গোপেন ধাক্কা দিয়ে বল্লে, "আরে না না, তুই ভয়ানক ভয়কাতুরে। আজ ভোরে আহাম্মদ কাকার জামাই এসেছেন, তাই তোকে খবরটা দিতে বললেন।" আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললুম, "কে? খলিল ভাই এসেছেন? আগে বলতে হয়, চল চল শীগগির চল।" এখানে বলে রাখা ভাল যে আমাদের খলিল ভাই ভারী রসিক লোক, দুনিয়ার সব খবর তিনি রাখতেন আর এমন সুন্দর করে সে সব গল্প করতেন যে একবার শুনতে বসলে নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলেই যেতুম। আমরা গিয়ে দেখি খলিলভাই তখন শালা-শালী এবং পাড়ার কয়েকটি ছেলেদের নিয়ে আসর জমিয়ে ফেলেছেন; আমাদের দেখেই বললেন, "এই যে বাবুদের ঘুম ভেঙ্গেছে দেখছি; তারপর গোপেন বুঝি হনুমানটাকে ধরে আনলে?" হঠাৎ আমার বুড়ো অঙ্গুলটার দিকে নজর পড়তেই বলে উঠলেন, "আরে এযে দেখছি একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ!—ব্যাপার কি হে?" আমার দুরবস্থার কথা জানালুম। ইতিমধ্যে করিম চাচা, রমেশ ঠাকুরদা ও মৌলবী সাহেব একে একে এসে উপস্থিত হলেন। আহম্মদ্ মামাও বাজার সেরে ফিরলেন। আঙ্গুলহাড়া

থকে বিতর্ক ক্রমশঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে গিয়ে পড়ল। যে যার নিজের অভিজ্ঞতা আর মতামত জানাতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। আহম্মদ মামা সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ডাক্তার যদি থাকে ত' সে আমাদের ফজলু ডাক্তার, ওষুধ কিনবার দরকার করে না, শুধু প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে মাদুলিতে পুরে ধারণ করলেই রোগ সেরে যায়।" আসর এমনি জমে ল্লা যে কিছুক্ষণের জন্য আমার আঙ্গুলের যন্ত্রণার কথা ভুলেই গেলুম। খলিল ভাই ভাল করে বসে নিয়ে বললেন, "পৃথিবীতে চিকিৎসা শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে একমাত্র জার্ম্মানীতে। আপনাদের কাছে আমি একটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করব যার থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, জার্ম্মান ডাক্তারদের দ্বারা কিভাবে অসাধ্য সাধন হয়।" ঘরের মধ্যে মুহূর্ত্তে হট্টগোল থেমে গেল। খলিল ভাইয়ের ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি যখন ম্যারিকা, র‍্যাঙ্গুা, প্যারী প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঘটনা উল্লেখ করেন, তখন মনে হয় যেন তিনি সদ্য সে সব যায়গা ঘুরে এসেছেন! সবাই গল্প শুনবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন, শুধু মামা আর গোপেন যেন কোথায় উঠে গেল! খলিল ভাইয়ের গল্প চলল, "সে আজ সাত-আট বছর আগের কথা, সুভাষবাবু তখন বার্লিন গিয়েছিলেন গল্‌ষ্টোন অপারেশনের জন্য। জার্ম্মানীর সেরা সার্জ্জেন ভন্ পেপেন্ সেই অপারেশন করেন। অপারেশনের কিছুদিন পরে সুভাষবাবু আর ভন্ পেপন্ একখানা মোটরকারে বেড়াতে গিয়েছিলেন শহরের বাইরে। তাঁদের গাড়ীর আগে আগে আর একখানা গাড়ী ছুটছিল কতকগুলি বাঙ্গালী আরোহী নিয়ে। সামনে ছিল একটা রেলওয়ে ক্রসিং। প্রথম গাড়ীখানা যেমন সেই ক্রসিং পার হতে যাবে আর কোত্থেকে একটা ট্রেন হুস্ করে এসে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। ও দেশের ট্রেনের স্পিড কি!

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই তিন-চারশ মাইল পাড়ি দেয়
এদিকে সেই প্রথম গাড়ীখানা একেবারে ধুলো হয়ে গেছে। আরোহীদে
মধ্যে যারা ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা সবাই অক্ষ
ছিলেন, কেবল গাড়ীর মালিক ট্রেনে কাটা পড়েছিলেন; সেও আব
আশ্চর্য্য রকম, কোমর থেকে ওপর দিকটাতে একটা আঁচড়ও লাগে
কিন্তু নীচের ভাগটা একদম ছাতু হয়ে গিয়েছিল। সুভাষব
ব্যস্ত হয়ে সার্জ্জেনকে বলিলেন, "এ আমার দেশের লোক, যে
করে হোক একে বাঁচাতে হবে।" সার্জ্জেন বললেন, "কেস্ খুব সিম্পল
রোগীর নীচের অর্দ্ধেক বাদ দিতে হবে, আর ঐ যায়গায় একটা ভ
মানুষের নীচের অর্দ্ধেক কেটে নিয়ে জুড়ে দিলেই ও আবার চলে যি
বেড়াতে পারবে; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভাল অর্দ্ধেক এখানে পাই কোথ
তাছাড়া এক্ষুনি না পেলে ওকে আর বাঁচান যাবে না। শহরে হলে যে
থেকে একটা ভাল দেখে বিদেশী কয়েদী বেছে নিয়ে কাজ চালিয়ে দিতু
কিন্তু এখন একে বাঁচান দেখছি অসম্ভব।" বলতে বলতে হঠাৎ ডাক্তা
মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সামনেই মাঠের ওপর কতকগুলি
চরে বেড়াচ্ছিল, সেই দিকে চেয়ে সার্জ্জেন বললেন, "ইউরেকা! ও
একটাকে দিয়েই আমার কাজ হতে পারে।" বলেই তিনি কাজে লে
গেলেন; সুভাষবাবুও যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোক
কোমর থেকে নীচের ভাগ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল, আর এ
নাদুস-নুদুস গাই গরুর পাঁজরার নীচে থেকে কেটে নিয়ে বেশ
ভদ্রলোকটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন পরেই তিনি সুস্থ
সস্ত্রীক দেশে ফিরে এসে আবার চাকুরীতে যোগ দিলেন। আপ
হয়ত ভদ্রলোকটির পরিচয় জানবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছেন কিম্বা

অনেকে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। অতশতে দরকার কি, সিভিল-লিষ্ট খুলে দেখুন সাবডেপুটিদের মধ্যে নেপেন সরকারের নাম



পাবেন। ইদানিং তিনি ডেপুটি হয়েছেন, আবার রায় সাহেব খেতাবও পেয়েছেন। সে যা হোক্ এখন ভদ্রলোক বীর গাঁয়ে পোষ্টেড, আটশ'

টাকা মাইনে পান ও দৈনিক আট সের দুধ দেন। কাছারি থেকে ফিরলেই গিন্নী একটা কেঁড়ে নিয়ে এসে খানিকটা দুধ দুয়ে নেন তবে চা জলখাবার তৈরী হয়; এত আমার নিজের চোখে দেখা।" হাসি আর চাপা গেল না; সমস্ত ঘরটা হাসির চোটে ফেটে পড়বার মত হল। হঠাৎ বুড়ো আঙ্গুলটায় একটা জ্বালা অনুভব করলুম। ভাবলুম হাসতে গিয়ে অসাবধানে কি রকম লেগে গেছে বুঝি, কিন্তু হাতটা সরিয়ে আনতে গিয়ে দেখি নাড়তে পাচ্ছি না। ভাল করে চেয়ে দেখি গোপেন শক্ত করে আমার হাতটা ধরে আছে আর মামা বুড়ো আঙ্গুলটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে এনেছেন; পাশেই পড়ে আছে একটা পেন্-নাইফ, টিংচার আইডিন্, পুঁজ, রক্ত, তুলা ইত্যাদি। যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই, মনে হ'ল শরীরটা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। আশ্চর্য্য খলিল ভাইয়ের ক্ষমতা!



একলাটি গঙ্গার ধারে বসে আছি। কোলকাতাতেই, তবে আউটরাম ঘাটে নয়। সেখান থেকে আধমাইলটাক আরো পশ্চিমে যান, কাঠের পোলটা পেরিয়ে দেখবেন—খানিকটা জায়গা বেশ গাছে-ঢাকা ঘাসে-ভরা আর সেখান থেকে জমাট পাথরের বাঁধ নেমে গেছে জলের কোল পর্য্যন্ত। যার ওপরে একটার পর একটা ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে—ছলাৎ ছলাৎ—। অবশ্য এ আজকের কথা নয়, পাঁচ-ছ বছর আগের স্মৃতি। আমি বসে আছি সেখানে একা, শীতকাল, সন্ধ্যার সময়। একটু একটু কবিত্ব এসে যাচ্ছে, কিন্তু কি করি, ওখানে গেলে নেহাত অরসিকের মনেও রঙ ধরে যায়, সেও বেসুরো গলায় গান গায়, তার বন্ধ হৃদয়ের সমস্ত দরজা জানালা খুলে যায়, জীবনে সুখের সন্ধান, আশার আলো সে দেখতে পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য অরসিকেরা ওপথ ভুলেও মাড়ায় না। আমি একা ওখানে বড় একটা যেতুম না, প্রতিদিনই আমার সঙ্গে থাকত আমজাদ। সে আমার খুব ছোট বেলাকার বন্ধু। স্কুল কলেজ পালিয়ে গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেন কি আর কোথাও গিয়ে সিগারেট খাওয়া, আর বড় হলে কি হব—সেই চিন্তা করা আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপার

ছিল। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা কি ছিল জানেন? দেশ-ভ্রমণ। সমস্ত দুনিয়াটা একবার দেখে আসব এই ছিল আমাদের আশা। কিন্তু আমরা যে বাঙ্গালীর ছেলে! তাই আমাদের আশা স্বপ্নই রয়ে গেল, বাস্তবে পরিণত করা আর হ'ল না। তাই আমি আজ ইস্কুল মাষ্টার আর আমজাদ মসিজীবী! যাক্, সে দিন আমি কেন একা বেড়াতে গিয়েছিলুম তাই শুনুন। আমজাদ খবর পেয়েছে তার একমাত্র ছোট ভাই রোগশয্যায়, অবস্থা সঙ্কটজনক; তাই সে আমাকে খবর না দিয়েই দেশে চলে গিয়েছে। আমি একাই চলে এসেছি গঙ্গার ধারে। কি করছিলুম মনে নেই, তবে নিশ্চয়ই ঢেউ গুনছিলুম না। মাঝে মাঝে জাহাজের বাঁশী বাজছিল, কখনও মিহি সুরে কখনও মোটা সুরে। যেন একটি জাহাজ প্রশ্ন করল অপর একটি তার উত্তর দিল। মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠল, বুঝি সাগরপাড়ি দেওয়া আর হয় না। আমাকে যে যেতেই হবে, এই একঘেয়ে বাঙ্গালী জীবন ভাল লাগে না। ভগবানের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি এই পৃথিবীটা ঘুরে ফিরে না দেখলে জীবনটা যে বৃথাই যাবে। শুধু এই পৃথিবী কেন আজ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধি যতদূর নাগাল পেয়েছে তার সব কিছুই জানবার বুঝবার একটা অদম্য স্পৃহা আমাকে পাগল করে তুলেছিল; কিন্তু সে আলো দেখাবে কে? হয়ত প্রত্যেকেরই জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে সত্যিকারের মানুষ হতে চায়, মানুষের মত বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু আমাদের সংসার, আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম এমনি করে আমাদের বাঙ্গালী জাতটাকে পঙ্গু করে রেখে দিয়েছে যে, তার ফলে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখে একটা চাকরি-বাকরি দেখে নাও, যে-থা করে সংসারী হও, বুড়ো বাপ মা, ভাইবোন যে যেখানে আছে তাদের দেখা শুনা কর, ব্যস্। চুলোয় যাক্ ও সব কথা; আসল ব্যাপারে

আসা যাক্। সবে সূর্য্য ডুবেছে, আকাশে আর জলে রঙএর বিচিত্র পরিবর্ত্তন দেখছি এমন সময় আমজাদ উপস্থিত হ'ল উস্কখুস্ক চেহারা নিয়ে। তাকে দেখেই আমার বুঝতে বাকী রইল না যে সে কি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে।

আমজাদ—"তোমাকে বাড়ীতে না দেখে এখানে চলে এলুম।"

আমি—"দেশ থেকে কখন এলে ?"

আমজাদ—"এই ত' ঘণ্টাখানেক হ'ল এসেছি। ভাইটি আমার পরশু রাত্রে মারা গেছে। বাবা ও মা বড় বেশী মুষড়ে পড়েছেন, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে লিলিকে নিয়ে ; খাওয়া দাওয়া ছেড়েই দিয়েছে, তার ওপর দিন রাত অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে রয়েছে।"

আমি—"তোমার এ অবস্থায় চলে আসাটা উচিত হয়নি।"

আমজাদ—"কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারলুম না। সারা বাড়ীতে ঐ থমথমে ভাব আমাকে যেন কেমন অভিভূত করে ফেলেছিল—না পারতুম কাঁদতে, না পারতুম কাউকে সান্ত্বনা দিতে। বিশেষ করে আমার লিলি বোন, ঐটুকু মেয়ে, কিন্তু ক' মাস ধরে কি সেবাটাই না করেছে, আর তার পুরস্কার এই ?"

আমি—"খোদার ইচ্ছে কে রদ করবে বল। যাক্ তোমার এ সময়টা চলে আসা কোন মতেই উচিত হয়নি। নিজে শক্ত হও, বাড়ীতে বাপ মা বোনের কাছে কাছে এখন কিছুদিন থাক।"

আমজাদ—"আমার যাওয়াটা যে দরকার তা এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু তুমি এমন সরে সরে থাকতে চাইছ কেন বলত ? আমাদের দুঃখের ভার তোমাকেও বইতে বলছি না! এসেছিলুম তোমার কাছে মনটা একটু হালকা করে নিতে, আর তুমি—"

আমি—"আরে ছি ছি, আমি মোটেই তা mean করিনি। আমাকে ভুল বুঝ না ভাই, আমি তোমার বাড়ীর কথাই কেবল ভাবছি। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? চল কাল সকালে আমরা দু'জনেই তোমাদের দেশে যাই।"

আমজাদ—"সে কি? তুমি যাবে আমাদের দেশে? আর এতকাল ধরে খোসামোদ করে এসেছি আমাদের দেশে বেড়াতে যাবার জন্য, তখন তোমার এক গোঁ ছিল 'লজ্জা করে'। সত্যিই যাবে, না ঠাট্টা করছ?"

আমি—"ঠাট্টা করবার সময়ই বটে! যাক্ সে কথা; আমি বলছি যাব এবং বাড়ী গিয়ে আজই বলে-কয়ে ঠিক করে ফেলব। এখন চল একটা সিনেমায় যাওয়া যাক্। একটুও সময় নেই, চট্ করে ওঠ।"

সিনেমা দেখে আমজাদকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে বাড়ী এলুম যখন, তখন রাত দশটা রাত করে বাড়ী ফেরার জন্য যথানিয়ম বকুনি খেতে হ'ল, তবে ওসব আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, আর তাছাড়া বড় হয়েছি, জানতুম কেউ মারবে না। রাত্রে শোবার আগে পরের দিন আমজাদদের দেশে যাওয়ার জন্য ভাবীর মারফত বাবা মার কাছে অনুমতি চাইলাম। তদ্বিরের ত্রুটি করিনি। তাই সহজেই অনুমতি পেলুম আর তাছাড়া আমার 'special ground' ছিল যে, এর আগে আমি কখনও বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনি, কেননা আমার পরের বাড়ী যেতে ভারী লজ্জা করত। আমার বন্ধুর ভ্রাতৃ-বিয়োগের সংবাদ শুনে বাড়ীতে সকলেই খুব দুঃখিত হলেন এবং আমার যাওয়াটাও সকলে সমর্থন করলেন। ভাবী সময় বুঝে বললেন, "কনে বুঝি এবার ঘর ছেড়ে বরের খোঁজে বেরুচ্ছেন?" আমি কোথাও যেতে চাইতুম না বলে আমাকে সবাই মেয়েলোকের

সামিল করে নিয়েছিল। আমি রাগ করে বল্লুম, "দেখ ভাবী, একজনের এমন বিপদে ঠাট্টা করা তোমার মোটেই উচিত হচ্ছে না।

ভাবী—"আরে ছোঃ! ঠাট্টা কে করছে, তবে দেখো ভাই, ঐ লিলিকে দেখে যেন ভেড়া বনে যেও না। ছেলেমানুষ, একা ছেড়ে দিতে ভয় হয়।"

আমি—"Don't be silly—ঐ লিলি কি রকম মেয়ে তা জান? অমন ভ্রাতৃবৎসল, সেবাপরায়ণা মেয়ে দেখা যায় না। আর আমিই বা তাকে দেখব কি করে, আমজাদের বাবা ভয়ানক গোঁড়া, ভীষণ পর্দা ওদের বাড়ীর মেয়েদের।"

ভাবী—"অস্বীকার করছি না লিলি গুণবতী মেয়ে, খোদার কাছে প্রার্থনা করি শুভ-দৃষ্টির সুযোগ তোমাদের দু'জনকে মিলিয়ে দিন!"

আমি—"অমন করলে আমি কিন্তু যাব না, হ্যাঁ। এত কাঠখড় পুড়িয়ে অনুমতি পেলুম, এখন উনি এলেন বাগড়া দিতে।"

ভাবী—"আরে না না,বাগড়া দেব কেন? আশীর্ব্বাদ করি যাত্রা শুভ হোক্। ভবিষ্যতের জন্য ঐ পথ তোমার কায়েম হয়ে থাক্।"

আমি—"ধ্যৎ, আশীর্ব্বাদ করবার আর কিছু পেলে না বুঝি?"

পরদিন সকালে আমজাদ আমাদের বাড়ীতে এলো। বাড়ীর সকলেই ওকে ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। জলযোগ সেরে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম। আমার জীবনে সেই প্রথম এই ধরণের যাত্রা। বেরুবার সময় ভাবী আবার টিপ্পনী কাটতে ছাড়লেন না। আমজাদের গ্রাম কোলকাতা থেকে খুব বেশি দূরে নয়, কিন্তু যেতে সময় লাগে অনেক। তার কারণ ষ্টেশন থেকে প্রায় ছয় সাত মাইল হাঁটতে হয় মেঠো পথ ধরে; বর্ষাকালে গরুরগাড়ী। যখন তাদের বাড়ী পৌছলুম

তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। আমদাজ আমাকে নিয়ে তাদের বাড়ীর দাওয়ায় একটা আসন পেতে বসতে দিল। ছোট্ট বাড়ী একেবারে পাড়াগাঁ। চারদিক নিঝুম, সামনে একটা আম কাঁঠালের অপরিষ্কার বাগান, নানারকম গাছ-গাছড়ায় জঙ্গল হয়ে আছে, আশপাশেও জঙ্গল, কাছেই একটা বড় পুকুর আছে, পানায় ভর্ত্তি, হঠাৎ দেখলে মাঠ বলে ভুল হয়। একটু পরে আমজাদ বাড়ীর ভেতর থেকে বেরুলো, সঙ্গে এলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, লম্বা চওড়া শক্তিমান পুরুষ, দেখলেই ভক্তি হয়, শ্রদ্ধা হয়। আমজাদের কাছে শুনেছিলুম তার বাবা ভারী রসিক লোক, জীবনে অনেক আঘাত তিনি পেয়েছেন কিন্তু এখনও শক্ত আছেন। তাঁকে কেউ নাকি কখনও কাঁদতে দেখেনি, এমন কি তিনি কখনও গম্ভীর হয়েও থাকতেন না। এবারে তিনি একটু মুশড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছেন। যথাবিহিত কুশলাদির পর তিনি আমাদের স্নানাহারের জন্য তাগিদ দিলেন। বিকালে পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে দেখি আমজাদের বাবা যেন কি একটা সমস্যায় পড়েছেন। আমজাদকে একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি?"

আমজাদ—"রাত্রে শোবার ব্যবস্থা কোথায় হবে তারি ঠিক হচ্ছে।"

আমি—"কেন তোমাদের এই বাইরের ঘরটি ত' ভিতর থেকে একেবারে আলাদা, এইখানেই ব্যবস্থা হতে পারে!"

আমজাদ—"ব্যাপার হচ্ছে যে, আমাদের বাড়ীটা ছোট, ভিতরে মাত্র চারটে ঘর আর বাইরে এই একটি। কেন জানিনা এ ঘরে আমাদের শোয়া চলবে না।"

আমি—"আমি এলে তোমরা এরকম মুস্কিলে পড়বে তা জানলে আমি

কখনই এসে তোমাদের এ অবস্থায় বিব্রত করতুম না। আমি না হয় রাতটা ষ্টেশনে—”

আমজাদ বাধা দিয়ে বলল, “না বুঝে কথা বল কেন? আমার মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলছি তা ধরা উচিৎ নয়। আমাদের শোবার যায়গা ভেতরেই হয়েছে কিন্তু বাইরের ঘরটা নিয়ে কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। আমাদের এখানে কেন শোয়া চলবে না তা ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা কি ব্যাপার যেন বাবাকে চিন্তিত করে তুলেছে। চল বাবার কাছে।”

আমার কাছে সবই যেন হেঁয়ালি ঠেকতে লাগল। কিছুই বুঝতে পারলুম না। কোথায় যে এদের অসুবিধা, আর কিই বা এদের চিন্তার কারণ তা জানবার ভারী ইচ্ছা হ'ল। আমজাদ তার বাবাকে গিয়ে সোজা প্রশ্ন করল—

“আচ্ছা বাবা বাইরের ঘরটায় কি হয়েছে?”

“তুই ত জানিস্, অসুখের গোড়া থেকেই খোকা ঐ ঘরে থাকত, কিছুতেই ভেতরে যেতে চাইত না, শেষ কালে তোর মা আর লিলি ঐ ঘরে এসে রাত জাগতে লাগল। তোর মা আর আমি কিই বা করেছি, লিলি আমাদের কিছু করতে দিলে ত'! তিনমাস একটানা মা আমার আজরাইলের সঙ্গে যুঝে শরীরের কি হালই না করেছে। যাক সে-সব কথা। পরশু রাত্রে তোর আশরফ চাচা এ' ঘরে শুয়েছিল। হঠাৎ মাঝ রাত্রে চীৎকার করে ওঠে। আমরা সবাই গিয়ে দেখি তোর চাচা মূর্চ্ছা গেছে। আর বিছানা ছেড়ে মাটিতে পড়ে আছে। অনেক চেষ্টার পর যখন জ্ঞান হ'ল তখন কি বলল জানিস? বলল, মাঝরাত্রে নাকি খোকা এসেছিল; শুধু তাই নয়, তার গায়ে মাথায় ঠাণ্ডা হাত দিয়েছিল

তারপর কি হ'ল তা বলতে পারল না। কালরাত্রে মৌলুবী সাহেব অনেক রাত পর্য্যন্ত ঐ ঘরে কোরাণ তেলাওয়াৎ করেন, তারপর যখন শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েন, তখন তিনিও ঐ রকম ভয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান। তাই তোমাদের ওখানে শুতে বারণ করেছি। আমি কালই খোকার আত্মার শান্তির জন্য বড় বড় মৌলনাদের বিধান নেব।" কেন জানিনা হঠাৎ গাটা শিউরে উঠল, তবু এ ঘটনায় মনটা কিছুতেই সায় দিতে চাইল না, বললুম, "আপনারা যা ভাবছেন তা নয় বলে আমার মনে হয়। নিশ্চয় এর মধ্যে অন্য কোন রহস্য আছে। যদি অনুমতি দেন তা' হলে আমজাদ আর আমি আজ রাত্রে এ ঘরে থেকে পাহারা দেব।"

"আমার আপত্তির কোন কারণ নেই তবে ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে নেওয়া ঠিক হবে কি বাবা? বিপদ বলতে আমি বলছি বেশি রকম ভয় পেয়ে জ্বর-বিকার হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্য নয়।"

"সেই জন্যই ত' বলছি আমরা দু'জনে থাকব, তা'হলে ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। আপনি কিছু ভাববেন না, আমরা আজ রাত্রে এই ঘরেই থাকব।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমজাদ আর আমি বাইরের ঘরটাতে এসে বসলুম। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমজাদের মুখের দিকে চাইতে তাকে খুব প্রসন্ন বলে মনে হ'ল না, বললুম আমার উদ্দেশ্যটা কি ব্রাদার অনুমোদন করছ না? কিন্তু আপত্তির কারণ ত' খুঁজে পাচ্ছি না। এত সহজে পাওয়া এত বড় একটা এ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ কি ছেড়ে দেওয়া উচিত? আর তাছাড়া তোমার ছোট ভাইয়ের আত্মাই যদি হয়, মন্দ কি তার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করা যাবে'খন।"

আমজাদ—"আমি নিজের জন্য মোটেই ভাবছি না, আমি পাড়াগাঁয়ের

ছেলে, রাত-বিরেতে কত মাঠ জঙ্গল একাই পাড়ি দিয়েছি, যা তোমরা ভাবতেও পার না। কিন্তু গোঁয়ার্তুমি করে তুমি যে বিপদের সামনে



যাচ্ছ তার শেষরক্ষা করতে পারবে কিনা তাই ভাবছি। পরের ছেলে নিয়ে এসেছি, আমারও ত' একটা দায়িত্ব আছে!"

আমি—"ঐ সব মুরুব্বিয়ানা চাল ছাড় ত' দেখি। এখন আপাততঃ একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলা যাক্। আমি বলি কি, দু'জনে এক সঙ্গে রাত জেগে লাভ নেই। তুমি এখন জেগে থাক, মাঝরাতে আমাকে তুলে দিয়ে তুমি ঘুমিও আমি বাকি রাতটা পাহারা দেব। যদি কিছু দেখতে পাও, খুব আস্তে আমাকে জাগাবে।"

একটা লাঠি আর একটা টর্চ্চ নিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা খুব কম করে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমজাদও ঘুমুবার ভান করে শুয়ে থাকল। দুপুর রাত পর্য্যন্ত কিছুই ঘটে নি, আমজাদ আমাকে জাগিয়ে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়ল। হ্যারিকেনটা কখন আপনিই নিবে গিয়েছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। অনেক দূরে কোথায় কতকগুলি কুকুর ঝগড়া করছিল। টর্চ্চটা মাথার কাছে আছে কিনা দেখে নিলাম। হঠাৎ দেখি ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দরজার কাছেই কি যেন একটা শাদা নতুন জিনিষ নড়ে উঠল। একদৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকলুম। শাদা জিনিষটা আস্তে অস্তে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে এল! আমজাদকে ডাকতে পারলুম না। সমস্ত শক্তি আমি যেন হারিয়ে ফেলেছি, যেন প্যারালাইজড্ হয়ে গিয়েছি। ভয় যে খুব পেয়েছিলুম তা নয়, তবে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন শক্তিহীন হয়ে পড়ল, কথা বলবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। চোখ ঘুরিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু মাথা তোলবার ক্ষমতা নেই। উঃ একি বিড়ম্বনা! চোখ বন্ধ করে দেহমনের সমস্ত শক্তি আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করলুম, হঠাৎ কপালের ওপর একটা ঠাণ্ডা পাথরের মত হাতের স্পর্শ পেলুম, আর একটা হাত মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে বুকে এসে থামল। শরীরটা একবার থর থর্ করে কেঁপে উঠল! আর একবার শেষ চেষ্টা করে সমস্ত

অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিলুম, মরিয়া হয়ে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করলুম আমি; তারপর আস্তে আস্তে মাথার কাছ থেকে টর্চটা বাগিয়ে ধরলুম বাঁ হাতে। শ্বেত বস্তুটি তখন চলে যাবার মতলবে ছিল। চট্ করে তার হাতটা ধরে ফেলে টর্চ জ্বাললুম। কিন্তু একি? এ কাকে ধরলুম? এ ত কোন মৃতের আত্মা নয় কিম্বা কোন চোরও নয়, এ যে একটি কিশোরী! হঠাৎ চোখে মুখে আলো লাগতেই সে চম্‌কে উঠল, তারপর ভাল করে চারদিক দেখে নিয়ে পালাবার জন্য ব্যস্ত হ'ল।

"আমাকে ছেড়ে দিন, শীঘ্রি ছেড়ে দিন।"

"তুমি কে? তোমার নাম কি?"

"আমি লিলি, আমাকে ছেড়ে দিন।"

"লিলি!" মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, তাকে ছেড়ে দিতেই ছুটে পালিয়ে গেল। লিলি তখনও তার ছোট ভাইয়ের সেবা করার অভ্যাস ভুলতে পারে নি, তাই রাত্রে ঘুমের ঘোরে উঠে আসে একবার, তার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবার জন্য। সকালে উঠে এ কথা আর কাউকে জানাই নি কেননা লিলির করুণ দৃষ্টি যেন আমাকে সে কথা জানাতে বারণ করে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর কোনদিন প্রেতের উপদ্রব হয়নি।

কোলকাতায় এসে ভাবীকে বললুম, "কি ছাই আশীর্ব্বাদ করলে শেষ পর্য্যন্ত লিলিকে দেখতেই হ'ল।"

"আচ্ছা ভাই, কিছু ভেব না, লিলিকে তোমায় পাইয়ে দেবই। কিন্তু তখন যেন silly ভাবীকে ভুলে যেও না।" উত্তরে তিনি বললেন।

তারপর—। তারপর? সে সব প্রাইভেট কথা নাইবা শুনলেন। তবে একথা ঠিক যে বন্ধুর বাড়ীর ভূতের উপদ্রব চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি এখন প্রেতলোকের চর্চ্চা ছেড়ে প্রেমলোকের চিন্তায় মশগুল হয়ে আছি।



গদাধর চাকরি করত বর্দ্ধমান কালেক্টারিতে। মাইনে যা সামান্ত পেত তাতে বৃহৎ সংসারটি কোনরকমে চলে যেত; আর না চললেই বা করছে কি! জেলা অফিসে যাঁরা চাকরি করেন কিম্বা যাঁরা কোন কাজে সেখানে গিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, প্রত্যেকটি কেরানী বাবুদের টেবিল কাগজপত্র আর ফাইলে স্তূপাকার। কেননা এইটাই ওখানকার রীতি। টেবিলে কাঠ বেরুবার উপায় নেই তাহলেই চাকরি করা দায় হয়ে পড়বে! কাজ থাক চাই না থাক্ কাগজপত্র আর ফাইল দিয়ে টেবিল ভরে রাখতেই হবে। চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে কি চাদর বেঁধে সারাদিন আড্ডা মেরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় ফাইল নিয়ে বসে যারা বিস্তর কাজের অনুযোগ করে এবং সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের কি উপর ওয়ালার নজরে প'ড়ে তাদের প্রমোশন চট্ পট্ হয়ে যায়। গদাধর প্রথম প্রথম মন দিয়ে কাজ করে পাঁচটার মধ্যে টেবিল পরিষ্কার করে বাড়ী ফিরত। কিন্তু যখন দেখল বড়বাবু তাতে আরও বেশী কাজ তার ওপর চাপাতে লাগলেন, তখন আস্তে আস্তে অফিসের টেক্‌নিক্‌টা বুঝতে চেষ্টা করল। লড়াইয়ের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে ষ্টেশনারি পাওয়া যায় না। গদাধর তার অফিসের দেওয়া কাঁচের পেপার ওয়েট দু'টো যখন পকেটে করে বাড়ী নিয়ে গেল এবং হারিয়ে গিয়েছে বলা সত্ত্বেও নতুন পেপার ওয়েট পেল না, তখন

রেল লাইনের ধার থেকে দুটো গোল মতন পাথর কুড়িয়ে এনে পেপার ওয়েটের কাজ চালাতে লাগল। বর্দ্ধমান জেলার কলিয়ারী সম্পর্কীয় কাগজপত্র গুলো গদাধর রাখত। একদিন কোন এক কোলিয়ারীর সাহেবকে কি একটা ব্যাপার নিয়ে বর্দ্ধমান কালেক্টরীতে আসতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট অফিসে কি করে তাড়াতাড়ি কাজ আদায় করতে হয় সে কৌশলটা সাহেবের জানা ছিল। তিনি সরাসরি গদাধরের কাছে চলে এলেন। গদাধর সাহেব দেখেই তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেলা তিনটের সময় লম্বা সেলাম ঠুকে গুড্ মর্নিং জানাল। সাহেব মিষ্টি হেসে গদাধরের পিঠ চাপড়ে কাজের কথা পাড়ল। গদাধরকে পায় কে! খাস বিলিতি সাহেব পিঠ চাপড়ে হেসে কথা বলেছে, এযে সে কল্পনাই করতে পারে না। শুধু গদাধর কেন, বাঙ্গালী জাতটাই যে সাহেব দেখলে দুনিয়া ভুলে যায়। সাহেবের গোলামি করতে পারলে জীবন ধন্য মনে করে; মান সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, রাজত্ব সব কিছু বিলিয়ে দিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না। যাক্ গদাধর তাড়াতাড়ি কাগজপত্র খুঁজে বার করে ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে চলে গেল সই করাতে। সাহেব গদাধরের টেবিল থেকে একটা পাথরের পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছিল হঠাৎ কি মনে হতে পকেট থেকে ছোট একটা উকো বার করে পাথরটার একপাস একটু ঘষে নিল; তারপর একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস বার করে ভাল করে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করতে লাগল। গদাধর ফিরে আসতেই সাহেব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, "বাবু তুমি এ পাথর কোথায় পেয়েছ? আমাকে দিতে পার?" গদাধর দূর থেকেই সাহেবকে মনোযোগ সহকারে পাথরটা পরীক্ষা করতে দেখেছিল, মনে একটু খটকা লাগল; "বলল সাহেব এ পাথর ত' আমি দিতে পারব না, এটা আমাকে এক সন্ন্যাসী দিয়েছে।

যার তুমিই বা এটা নিয়ে কি করবে?" সাহেব চতুর লোক হলেও বুদ্ধিটা একটু মোটা, হেসে বলল, "আরে এ পাথরের ভিতর মাল আছে, তুমি অমনি না দিতে চাও, দাম নাও; কত নেবে বল দশ, বিশ, ত্রিশ কত? চট্ পট্ বলে ফেল।" ইতিমধ্যে অফিসের আরও দু'একজন নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে সাহেবকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা ব্যাপার দেখে গদাধরকে বাংলা করে পরামর্শ দিল যে, নিশ্চয়ই পাথরটা খুবই মূল্যবান সুতরাং কোন মতেই যেন সেটা হাতছাড়া না হয়, কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে ওটাকে দু' পাঁচ জায়গায় যাচাই করলে হয়ত হাজার টাকা দাম হতে পারে। গদাধর এবারে আর সাহেবের কথায় মজল না, একেবারে বেঁকে বসল। স্পষ্ট সাহেবকে জানিয়ে দিল যে, সে কোন দামেই ও পাথর বিক্রী করবে না! সাহেব দেখল এখন বেশী ঘাঁটালে সুবিধা হবে না, বরং পরে একদিন এসে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাথরটা নিতে হবে। সাহেব চলে যেতেই পাথরের পেপার ওয়েটটা নিয়ে একটা কনফারেন্স বসে গেল। সবাই রায় দিল পাথরটা নিশ্চয়ই অতি মূল্যবান এবং হাজার টাকায় ওটা অনায়াসেই বিকিয়ে যেতে পারে, চাই কি আরও বেশীও হতে পারে। শেষে ঠিক হল গদাধর এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে কোলকাতায় চলে যাক এবং কয়েকটা বড় বড় জহুরির দোকানে পাথরটা যাচাই করে দেখুক, কিরকম দাম উঠতে পারে।

এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গদাধর কলিকাতায় চলে এলো। মনে তার কত আশা। মোটা রকম টাকা পেলে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা ব্যবসা করবে। বিশেষ করে চোরা বাজারের ব্যবসাটা খুবই লাভজনক! প্রথমেই কোলকাতার বিখ্যাত স্যাকরার দোকানে গদাধর উঠল কিন্তু বেশীদুর এগোতে হ'ল না, কাউন্টার থেকেই পাগল আখ্যা

নিয়ে বিদায় নিতে হ'ল। প্রথমটা গদাধর একটু মুসড়ে পড়ল; তাই ত' তাকে যে কেউ আমল দিতেই চায় না! ভেবে দেখল যে তার বেশটা একটু কায়দা-দোরস্ত করতে হবে, পাথরটা উকো দিয়ে সাবধানে আগা-গোড়া ঘষে ফেলতে হবে, তারপর দোকানে গিয়েও সাজিয়ে গুছিয়ে তার বক্তব্যটা জানাতে হবে। দু'দিন পরে বেশ তৈরী হয়েই গেল আর এক দোকানে। কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারি পাথরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে মত দিল, পাথরটার মধ্যে আসল মাল কতখানি আছে বলা শক্ত, এ্যাসিডে না ফেললে সঠিক বলা যাবে না, তবে তারা পাঁচশ টাকা দিয়ে ওটা কিনে নিতে পারে! গদাধর দেখল আসল মালের পরিমাণ না জেনেই যদি পাঁচশ টাকা দিতে চায়, তা'হলে ওর দাম আরও বেশী হবে। গদাধর সোজা হ্যামিলটনের দোকানে চলে গেল। প্রথমেই গিয়ে বলল, যে অমুক কোলিয়ারী পাথর-বিশেষজ্ঞের মতে এই পাথরটা খুবই মূল্যবান, এখন যদি তাঁরা দয়া করে ওটাকে পরীক্ষা করে সঠিক মূল্য জানিয়ে দেন, তা'হলে সে অত্যন্ত বাধিত হয়। সাহেব কোম্পানীর লোক তখনই পাথরটা ভাল করে দেখে নিয়ে সেটাকে এ্যাসিডে ডুবিয়ে দিল। ফল জানা গেল—চারটি বেশ বড় এবং সাতটি অপেক্ষাকৃত ছোট মূল্যবান পাথর পাওয়া গেছে, এবং সেগুলি কেটে ঠিক আকারে এনে বিক্রি করলে বড়গুলি প্রত্যেকটি এক একটা হাজার টাকা এবং ছোটগুলি পাঁচ থেকে সাতশ' টাকা দাম পাওয়া যেতে পারে। তবে এতে পরিশ্রম অনেক, সেজন্য তাঁরা একসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকায় সবগুলি কিনে নিতে পারেন। গদাধর দেখল যে, সাহেবদের হিসাবে তাঁর অন্ততঃ পক্ষে সাত হাজার টাকা পাওয়া উচিত। ভেবে পরে দেখা করবে এই বলে পাথর ক'টি নিয়ে গদাধর বেরিয়ে পড়ল। কার্জ্জন পার্কে বসে সে একবার

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে নিল। সে এখন সাত হাজার টাকার মালিক, রেস খেলে নয়, লটারীতে নয়, চুরি করে নয়, একেবারে যাকে বলে ছপ্পর ফুঁড়ে টাকা এসেছে। উঃ! যতই সে ভাবছে, ততই



তার মাথা গরম হয়ে উঠছে। এত টাকা সে যে কল্পনাই করতে পারছে না। সা-ত হা-জা-র টাকা নিয়ে কি করবে সে? কোথায় বা রাখবে?

পরদিন গদাধর আরও তিন চারটে দোকান ঘুরল, সবাই লোলুপ-

দৃষ্টিতে পাথর গুলি দেখে, কিন্তু দামের কথা উঠলে তারা এমন কথা বলে যে গদাধরের ইচ্ছা করে ঠাস করে একটা চড় কসিয়ে দেয়। এক ব্যাটা জোচ্চোর আবার কোন ফাঁকে দু'টো পাথর সরাবার মতলবে ছিল, কিন্তু গদাধরের চোখে ধুলো দেবে সে এখনও মায়ের পেটে! মহা বিরক্ত হয়ে গদাধর ভাবল আর একটা দোকান সে দেখবে, এবং যদি সুবিধা না হয় হ্যামিল্‌টনে গিয়েই আপদ বিদায় করবে। দরকার নেই অত ঝামেলায়; পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনাই লাভ। 'জুয়েল হাউস' কোলকাতায় একটা নামকরা দোকান। 'জয় মা দুগ্‌গা' বলে গদাধর দোকানে উঠল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, "দেখুন মশাই, আমার কাছে কতকগুলি দামি পাথর আছে যা হ্যামিল্‌টনাদের মতে আট হাজার টাকায় অনায়াসেই বিক্রি হতে পারে। এখন আপনারা যদি কিনতে চান কত পর্য্যন্ত দাম দিতে পারেন বলুন ত'?" ম্যানেজার হাসতে হাসতে বলল, "আগে দেখি পাথরগুলি কেমন। না দেখেই দাম বলি কি করে।" "কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখবার আর কি আছে? সবাই ত' দেখেছে কিন্তু কেনবার চাইতে মেরে দেবার চেষ্টাই দেখে এসেছি বেশী। যদি কেনবার ইচ্ছা থাকে দামটা চট্‌ করে বলে ফেলুন, পোষালে পাথরগুলি রেখে যাব'খন, তখন যত খুশি দেখবেন।" ম্যানেজার একটু কড়া হয়ে বললেন, "দেখুন আপনার সঙ্গে বাজে তর্ক করবার সময় নাই! আপনি যদি কিছু বেচতে এনে থাকেন বার করুন আর তা না হলে হ্যামিলটনেই যান।" অগত্যা গদাধর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, "বেশ দেখুন।" কিন্তু একি! সে প্যাকেটটা গেল কোথায়? এ পাশের পকেট ওপাসের পকেট, বুক পকেট, ভেতরের পকেট, কোথাও ত' নেই! এঁ্যা গেল কোথায়? তবে কি···গদাধর

আর ভাবতে পারল না, কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছে, গদাধর বর্দ্ধমান ফিরে গেল। সহকর্ম্মিরা আগ্রহের সঙ্গে ঘিরে দাঁড়াল ; গদাধর মুচকি হেসে বলল "দুর, দুর, সাহেব বাজে ভাঁওতা মেরেছিল, তোদের কথা শুনে হয়রানির এক শেষ।"

"সে পাথরটা কি হ'ল ?"

"সেটা দুত্তোর বলে লালদীঘির জলে ফেলে দিয়েছি।"

"বেশ করেছিস, আপদ গিয়েছে, তা এখন রেল লাইনের ধার থেকে আর একটা পাথর কুড়িয়ে আন, পেপার ওয়েট ত' চাই আর একটা !"

গদাধরের আর একটা পেপার ওয়েটের জোগাড় এখনও হলো না। সকাল-বিকেল রেল লাইনের ধার খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু মনের মত পেপার ওয়েট পাচ্ছে না।



আব্দুলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট খানসাহেব আলিমুদ্দিন সরকারকে পাঁচটা গ্রামের লোক ভক্তি করে। খাঁ সাহেব লোকটী খুবই ধার্ম্মিক আর গরীবের দুঃখ তিনি বোঝেন। সে দিন সকালে সোলেমান মুদির দোকান ঘরটার সামনে বসে ইউনিয়ন ফুডকমিটির কাপড় বিলি নিয়ে একটা তীব্র সমালোচনা চলছিল। কমিটির সেক্রেটারী নাকি অর্দ্ধেক কাপড় নিজের শ্বশুর বাড়ী চালান করে দিয়েছেন। বিশুটা সবে ম্যাট্রিক পাশ করে সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে চাকরী পেয়েছে। ছুটীতে দেশে এসেছিল। সে বল্লে একটা সমবেত দরখাস্ত করে উপরওয়ালাদের কাছে আমাদের অভিযোগ জানাতেই হবে। হরে মাষ্টার ধমক দিয়ে বলল "রেখে দে তোর উপরওয়ালা। ঐ উপরওয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেই ত তবে কাপড়ের 'কোটা' ঠিক হয়েছে। একটা করে জিনিষ কণ্ট্রোল হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার 'কোটা' ঠিক হচ্ছে 'ডিলার' নিযুক্ত হচ্ছে, লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে আর উপরওয়ালারাও ফেঁপে ফুলে মোটা

হচ্ছে। যার তিন পুরুষ ধরে ব্যবসা চলছিল সে জ্বাল্‌ল লালবাতি আর যে ব্যাটা কশ্মিন্‌ কালেও কোন ব্যবসা করেনি, সে পেল 'ডিলারের লাইসেন্স'। যার সত্যকারের অভাব তার অভাব কোন দিনই ঘুচ্‌ল না আর যে তদ্বির করতে পারল সে পেল প্রয়োজনের চেয়েও সাতগুণ বেশী মাল। ওপরওয়ালারা তোর অভিযোগ শুনে সব করবে!" আক্কেল চাচা দাড়ি নেড়ে বুদ্ধি দিল, "অত ঝামেলায় দরকার কি বাপু, ডবল দাম ফেললেই ঐ কাপড় সেক্রেটারীর সুম্বুন্ধির কাছ থেকেই বেরোবে।" বিশু আবার কি আপত্তি করতে যাচ্ছিল সিধু খুড়ো মুখ বিকৃত করে বললেন, "যা, ফ্যচ ফ্যচ করিস্‌নে, সে দিনকার ছেলে, সহরে মানুষ হলি, তুই গাঁয়ের হাল চালের কি খবর রাখিস্‌ র‍্যা ?" জোর আলোচনা চল্‌ছে, এমন সময় দূরে দেখা গেল কছিমদ্দি মোড়ল হন্‌ হন্‌ করে এই দিকেই আস্‌ছে। ভাব দেখে মনে হ'ল না যে সে আড্ডার দিকে আসছে; কোথাও যেন জরুরি কাজে চলেছে। হ'রে মাষ্টার হাঁক দিল, "বলি ও মোড়ল দা, একবারটি এদিক পানে এস দিকি ভারি গোল বেধেছে এই কাপড় নিয়ে।" মোড়ল ছুটতে ছুটতেই বলে গেল "দাঁড়া ভাই খাঁ সাহেবকে মাটিটা দিয়েই আমি আসছি, বেলা উঠে গেলে আর হবে না।" খাঁ সাহেবকে মাটি দিতে (কবর দিতে) চল্‌ল কছিমদ্দি মোড়ল? তিনি মারাই বা গেলেন কখন! এই ত কাল সকালেও তিনি বোর্ডের মিটিংএ বাহাল তবিয়তে হাজির ছিলেন, এরই মধ্যে কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কিন্তু আশপাশের গাঁয়ের লোকদের যে জানাতে হবে। খাঁ সাহেবের জানাজায় (শেষ প্রার্থনা) লোক হবে না একি একটা কথা হ'ল। হরে মাষ্টার, আক্কেল চাচা, সিধু খুড়ো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল খাঁ সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করতে। মোড়লদারই বা আক্কেলটা কেমন?

গাঁয়ের মধ্যে কি উনিই একটা মানুষ, এতগুলো লোক পথে দেখা গেল কাউকে সঙ্গে যেতে পর্য্যন্ত বল্‌ল না !

হাতেমপুর, নন্দিগ্রাম, সৈয়দপুর কোন গাঁয়েই খবর পৌছুতে বাদ পড়ল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গ্রাম ভেঙ্গে দলে দলে লোক আলিমুদ্দিন সাহেবের বাড়ীমুখো চল্‌ল। হিন্দু, মুসলমান, ছেলে বুড়ো, যে যেখানে ছিল হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল। এখানকার সপ্তাহিক পত্রিকা একটা বিশেষ সংখ্যা বার করবার আয়োজন করতে লাগল। (কাগজ নিয়ন্ত্রণ আইনটা জানা থাকলে ভারত সরকারের অনুমতি না নিয়ে কখনই বার করত না।) মোক্তেটা একটা ছোট্ট জীবনী লিখে 'ইউনাইটেড্‌ প্রেসে' খবরটা পাঠিয়ে দিল। নন্দিগ্রামের জমিদার তাঁর সরকারকে পাঠালেন খোঁজ নিতে ক'টার সময় কবর দেওয়া হবে। সোলেমান মুদিও তাড়াতাড়ি দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

খাঁ সাহেবের বাড়ীর চারধার দিয়ে মাঠ, ঘাট, জঙ্গল ভেঙ্গে পাঁচটা গ্রামের লোক জমায়েত হতে সুরু করল। বাড়ীটার পূর্বদিকের বাগানের এক পাশে কটা মজুর কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। বোধহয় ঐ খানেই কবর দেওয়া হবে। কছিমদ্দি মিয়া মাথায় গামছা জড়িয়ে তদারক করছে। কিন্তু একি ? কামিনী ফুল গাছটার ছায়ায় একটা মোড়ার ওপর বসে কে ? উনি খাঁ সাহেব আলিমুদ্দিন সরকার বলে মনে হচ্ছে যেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ব্যাপারটা কিরকম গোলমেলে ঠেকতে লাগল। আলিমুদ্দিন সাহেব বসে আছেন কবরও খোঁড়া হচ্ছে, তাহলে মরল কে ? কাকেই বা কবর দেওয়া হবে ? খাঁ সাহেবও চারিদিক থেকে এত লোক আসতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন। হঠাৎ এত লোকের এক সঙ্গে আসবার কোন হেতুই তিনি ঠাহর করতে পারলেন না। মজুররাও

কোদাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল, কছিমদ্দি মোড়লও অবাক হয়ে চেয়ে থাকল। হরে মাষ্টার সোজা মোড়লের কাছে গিয়ে বল্‌ল "ব্যাপার কি মোড়লের পো, আমরা সবাই কি ভুল শুনলুম, তুমি না বলে এলে খাঁ-



সাহেবকে কবর দিতে আস্‌ছ।" খাঁ সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, "কি যা তা বল্‌ছ মাষ্টার, আমাকে কবর দেবে মোড়ল? কেন আমি মরেছি না কি?" হরে মাষ্টার জিভ্‌ কেটে বল্‌ল "ছি ছি কি যে কাণ্ডটা ঘটে গেল। কিন্তু কোথায় যে কি গোল বেধেছে তা এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না।" মোড়ল এতক্ষণে ব্যাপারটা সামলে নিয়ে বল্‌ল, "গোল বেধেছে আমার বলার ভুলেও নয়, তোমাদের শোনার ভুলেও নয়, আসলে তোমাদের বুঝবার ভুলে। আমি বলেছিলুম খাঁ শাহেবকে মাটি দিতে

পোষ্ট কার্ড

যাচ্ছি অর্থাৎ কি না কবর দিতে নয় কোলকাতা থেকে ফুলের বীজ আনা হয়েছে তারই জন্য ভাল সারালো মাটি এক ঝুড়ি দিতে হবে, ঐ দেখ পাশে এক ঝুড়ি মাটি পড়ে রয়েছে।"



কথায় বলে বিবাহ ব্যাপারটা দিল্লিকা লাড্ডু, জো খায়া ও পস্তায়া জো নেহি খায়া ও ভি পস্তায়া। আমি আপাততঃ খেয়েই পস্তাচ্ছি। আমার মতে খেয়ে পস্তানর চাইতে না খেয়ে পস্তান ঢের ভাল। বিয়ে করাটা যে দারুন ঝকমারি আর তাতে হাজার ল্যাঠা পোয়াতে হয় সে কথা মুখে না হোক মনে মনে সবাইকে স্বীকার করতে হবে। বিয়ের আগে বেশ ছিলুম। খাচ্ছিলুম দাচ্ছিলুম, আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিলুম। চাকুরি করে যা পেতুম মনের ফুর্ত্তিতে তা ইচ্ছামত খরচ করতুম। কিন্তু সুখে থাকতে ভূতে কিলোল। তাঁত বুনে খাওয়ায় মন উঠল না তাই মরতে এঁড়ে গরু কিনলুম। বন্ধু বান্ধব, এখন বুঝছি তারা ছিল শ্বশুর পক্ষের ফিফথ্ কলম, আমাকে ক্রমাগত পরামর্শ দিতে লাগল—বিয়ে একটি করে ফেল ভায়া, বাউণ্ডেলের মত ঘুরে ঘুরে শরীরের কি হাল হচ্ছে, দেখচ ত, বয়সও তো বাড়চে, এখন যদি বে-থা না ক'রবে ত কবে আর করবে? পরামর্শের ঠ্যালায় অতিষ্ঠ হয়ে একদিন দুত্তোর বলে রাজি হয়ে গেলুম বিয়ে করতে কিন্তু সর্ত্ত থাকল যে, আমি যাকে বিয়ে করব সে সুন্দরী কি বিদুষী না হলেও ক্ষতি নাই, দাবীও আমার

কিছু নাই কিন্তু মেয়েটি হবে একেবারে যাকে বলে মাটির মানুষ; মুখের উপর কথাটি বলবে না, আমার কোন কাজের প্রতিবাদ করবে না, আমার স্বাধীনতায় তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করবে না। আমার ফরমাস মত মেয়ে অনেক খোঁজাখুজি করে এক অজ পাড়াগাঁয়ে আবিষ্কৃত হল। বন্ধুবান্ধবরা আমার বেয়াকুবি দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ছাড়লনা। যাহোক মনের মতন বউ পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—অন্ততঃ অযাচিত পরামর্শের হাত থেকে রেহাই পেলুম। জীবন বীমার দালাল আর বিয়ের দালালের মধ্যে তফাতটা এইখানে দেখতে পাই যে জীবন বীমার দালালকে যদি বলি একটা বীমা আমি আগেই করেছি তবু সে নাছোড়বান্দা বলবে "আর একটা আমাদের কোম্পানিতে করে ফেলুন না স্যার, অনেক সুবিধা আছে।" কিন্তু বিয়ের দালাল সে সুযোগটি পায় না।

মোণ্টেটা আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। সে আমার গোবেচারী স্ত্রীকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না, নড়ে চড়ে কেবলই অনুযোগ করত "বলিহারি রুচি বাবা তোর। তোদের দুজনকে দেখে কে বলবে তোরা স্বামী স্ত্রী; ভাসুর ভাদ্দর বৌতেও অমন ভাবে থাকে না। মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি কর্। একদিন বৌদির গলা পঞ্চমে উঠুক, একদিন তোর গলা সপ্তমে উঠুক, তিনদিন কথা বন্ধ করে থাক্, তবেই ত দাম্পত্য জীবনের মজা বুঝবি। আমি ধমক দিয়ে বলি "থাম দিকি, আর লেকচার ঝাড়তে হবে না, আগে নিজে একটা বিয়ে করে আন্ তারপর এসে থতিয়ে দেখিস তুই সুখী না আমি সুখী!" মণ্টে টোপ্ খাবার মত ছেলে মোটেই নয়, সে রেগে-মেগে বলে "বটে, নিজে ল্যাজ কেটে আবার আমাকে বিয়ে করবার জন্ম জপান হচ্ছে, আমি হ্যাকা, কিছু বুঝিনা, না? ফের যদি আমার বিয়ের নাম মুখে আনবি ত

তোর মুখদর্শন করব না।" আমি তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য বলি "আহা চটিস্ কেন? আজ না হয় দু'দিন পরে তো করবি? চিরটিকাল তো আর আইবুড়ো থাকবি না? তাই বলি একটা মনের মতন সুপাত্রী পছন্দ করে রাখ" মেন্টে বাধা দিয়ে বলে "আমার মনের মত মেয়ে এ বাংলা মুলুক পাওয়া যাবে না বুঝলি? আমি বিয়ে করলে কি আর তোদের মত সজীব পুঁটুলি বিয়ে করব? আমার আইডিয়াল মেয়ে হচ্ছে একটা জীবন্ত ভিসুভিয়াস, একটা ভীষণ কাল বৈশাখী, একটা ভয়ঙ্কর সাইক্লোন, একটা নিদারুণ—"অসহ্য হয়ে পড়ে তাড়া দিয়ে বলি "আবার ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে, তোর আইডিয়াল মেয়ে ঘরে এনে তারপর লম্বা চওড়া কথা বলিস, এখন চুপ কর দিকি।"

শ্বশুরালয়ে দু'চার বার যাতায়াত করতেই, সম্পর্কীয় দূর সম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয় প্রায় ডজন খানেক শ্যালিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। বিয়ের পর এই শালির পালকে আমি উপরি কিম্বা ফাউ বলে মনে করি। শালিদের মধ্যে একটি ছিল একটু বেশী রকমের মুখরা এবং সে আমার স্ত্রীর "সই" হওয়ায় আমার উপর হামটা একটু বেশী করত। নাম তার শান্তি কিন্তু অশান্তির প্রতীক সে।

কারও সঙ্গে তার বনে না। নেহাৎ আমার স্ত্রীকে ভালমানুষ পেয়েছিল তাই তার সঙ্গে সই পাতিয়ে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পাড়ায় এমন মেয়ে নেই যার সঙ্গে শান্তি ঝগড়া বা মারামারি করে না। কেবল তার সইটি সাতেও থাকেনা পাঁচেও থাকেনা বলে আজ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সুবিধা করে উঠতে পারেনি। শান্তির বাবা লোকটি অতিশয় হিসেবি। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে তিনি জানেন। আমাকে একদিন নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রচুর খাওয়ালেন তারপর

একটু আড়ালে ডেকে বললেন "তোমার তো বাবা পাঁচটা বন্ধুবান্ধব আছে, শান্তির একটা হিল্লে করে দাও যদি বাবা তাহলে গরীবের একটা মস্ত উপকার করা হবে। পেন্‌সনের টাকায় সংসার চলে না তার ওপর চোখের সামনে ঐ আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ের জন্য গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। বেশ ঠাণ্ডা গোছের একটা ছেলের খবর যদি বলতে পার—ভাত কাপড়ের অভাব না থাকলেই হল (আজকালকার বাজারে ভাতের সংস্থান যদি বা হয় কাপড় মোটেই পাওয়া যায় না)—আমার মেয়ে আবার যে গাছ মন্দা।' তারপর একবার ভাল করে চারিদিক দেখে নিয়ে গলাটা একটু খাটো করে বললেন "ওর মা আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা একেবারে খেয়ে রেখেছে। তাই বলছি এমন ঘরে ওকে দিতে চাই যারা একটু মানিয়ে টানিয়ে নিতে পারবে। শশুর বাড়ীতে ওকে যেন কেউ খোঁটা না দেয়।" শান্তির বাবা যেতেই শান্তি পান নিয়ে হাজির হল! একটু দুষ্টমির হাসি হেসে বললে "কি ভাবা হচ্ছে?" আমি অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলুম "না এই তোমার কথাই ভাবছিলুম।" শান্তি অবাক হয়ে বললে "কি সর্ব্বনাশ আবার আমার ওপর নজর কেন? উহুঁ লক্ষণ মোটেই ভাল না। আপাততঃ আমার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে সে বেচারীর কথা একটু ভাবুন; রাত হচ্ছে যে সে দিকে খেয়াল আছে?" আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে বলি "তাইত কথায় কথায় বেশ রাত হয়েছে ত, কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার, তায় আবার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ, একা যাই কি করে? শান্তি হাসতে হাসতে বললে "ভয় নেই আমি পৌঁছে দিয়ে আসবখন; ও পাড়ায় আমার একটু দরকার আছে।" তার কথা শুনে তাজ্জব বনে যাই, জিজ্ঞাসা করি "তুমি পৌঁছে দেবে? একা ফিরতে ভয় করবে না?" শান্তি মরিয়া হয়ে বলে "না গো মশাই না,

অত ভয় করলে চলে না। পাড়ার ফচ্‌কে ছোঁড়াগুলো একদিন আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল, আমি অন্ধকারের মধ্যে যখন এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাতে লাগলুম তখন বাপ্‌ বাপ্‌ বলে সব দে ছুট। সেই থেকে বাঁদরগুমো আমার নাম রেখেছে বাঘিনী।" বাঘিনীই বটে, পথে ঘাড় মটকাবে কি না কে জানে! কি মনে হল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা শান্তি তুমি গাছে উঠতে পার!" শান্তি সহজ ভাবেই জবাব দেয় "সুপারি গাছটা ছাড়া—ও গাছটা ভারি পেছল কি না?" আর প্রশ্ন করতে সাহস হল না। কোন রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে শান্তির সঙ্গে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে একটা লণ্ঠন, তার চিমনি এত অপরিষ্কার যে কবির ভাষায় বলতে গেলে 'যতটুকু আলো দেয় তার বেশী ছায়া।' একেবারে সটান গিন্নির হেপাজত করে দিয়ে শান্তি বললে "নেরে তোর বর, একটু সামলে সুমলে রাখিস, যে ভয় কাতুরে, বাবাঃ।"

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মোণ্টের কথা ভাবছিলুম: কোন রকমে একবার গছাতে পারলে হয় তখন বাপধন বুঝবে যে হ্যাঁ আইডিয়াল মেয়ে কি চীজ। বাপস্‌ মেয়ে ত নয়, বাঘের বাচ্ছা। অমন মেয়ে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে যদি থাকে ত দেশ স্বাধীন হতে বেশী দেরী লাগবে না!

কোলকাতায় এসে মোণ্টেকে শান্তির বর্ণনা দিয়ে বললুম "একে বশ করা তোর কর্ম্ম নয়। তোকে স্রেফ ভেড়া বানিয়ে রাখবে বুঝলি? সে মেয়ে হুকুম চালাতেই জানে হুকুম মানতে রাজি নয়। খুব ত লেকচার ঝাড়ছিলি, পারবি একে বিয়ে করতে?"

মোণ্টে ভাল করে সব শুনে বললে "যাঃ যাঃ ও আমার আইডিয়াল মেয়ের সিকিও নয়।"

মোণ্টের ন্যাবলামি দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ভীষণ তর্কের ঝড়

ওঠে। ভয়ানক রকম রেগে গিয়ে আমি তক্তপোশের উপর সজোরে একটা চাপড় মেরে বলি "বেশ তুই যদি ঐ মেয়ে বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করতে পারিস তাহলে আমি তোকে গুরু বলে স্বীকার করে নেব; আর কোনদিন তোর সঙ্গে তর্ক করব না, যা বলবি মেনে নেব।" মোণ্টেও রাগের মাথায় বলে বসে "কুছ পরোয়া নেই, আমি তোর ঐ বাঘিনীকেই বিয়ে করব আর সেই সঙ্গে তোর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেব যে ঐ মেয়ের স্বভাব বদলাতে পারি কি না। আর তোদের চাইতেও সুখে শান্তিতে ঘর করতে পারি কি না।"

কিন্তু মার দিয়া! এতদিন ধরে কিছুতেই ফন্দি ফিকির ঠাউরাতে পারছিলুম না কি করে মোণ্টেকে বিয়ে দিয়ে আমাদের দলে ভেড়ানো যায়। শান্তির বাবাকেও একটু উপকার করতে পারলুম বলে মনে মনে যথেষ্ঠ আনন্দ পেলুম। একটা শুভদিন দেখে মহা হৈ চৈ করে মোণ্টের বিয়েতে বর যাত্রী গেলুম। মোণ্টে সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত মনের মধ্যে রীতিমত আতঙ্ক ছিল—কি জানি যে ক্ষ্যাপা ছেলে যদি হুট করে 'না' বলে বসে তাহলেই ত গাড়ী নর্দ্দমায়।

বিয়ে হয়ে গেল, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। মাসখানেক গা ঢাকা দিয়ে থাকলুম! ভয়ের কারণ যথেষ্ট ছিল। মোণ্টে যে শান্তিকে নিয়ে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না এ আমি ধরেই নিয়েছিলুম। হয়ত এতদিনে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিয়েছে। মোণ্টেটা গোঁয়ার কম নয় ত। আপশোষ হতে লাগল, দুর ছাই এ রকম ঝকমারি কাজে হাত না দিলেই হত। নিজের পাঁচটা ঝামেলাতেই অস্থির তার ওপর পরের ভাবনা ঘাড়ে চাপল।

হঠাৎ একদিন তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে এক

বিয়েবাড়ীতে। গিন্নি আর তার সই ভেতরে কোথাও গল্পে মশগুল ছিল, আমি আর মোণ্টে বাইরে হট্টগোল থেকে একটু তফাতে বসে নিজের নিজের সুখদুঃখের কথা আলোচনা করছিলুম। কায়দা করে মোণ্টেকে জিজ্ঞাসা করলুম তার বিবাহিত জীবন কেমন কাটছে, শান্তির সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে কি না। মোণ্টে হাল্কা ভাবেই উত্তর দিল "আর পাঁচজনের যেমন কাটছে আমাদের মধ্যে তার কোন ব্যতিক্রম নেই বরং তোদের চাইতে বেশ আরামেই আছি।" আমি অবাক হয়ে বললুম "তার মানে? তোদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হয় নি? তুই যা বলিস শান্তি সব শোনে?" মোণ্টে জোর দিয়ে বলে, "কেন শুনবে না; তোর বউ যতটা না তোর কথা শোনে তার চাইতে ঢের বেশী শান্তি আমার কথা শোনে।" মোণ্টের সব তাতেই বাড়াবাড়ি, একটু দম্ভভরেই বলি "আচ্ছা হাতে-নাতেই প্রমাণ হয়ে যাক্ কার বউ কেমন কথা শোনে। তুই শান্তির কাছে এক গ্লাস জল চেয়ে পাঠা আর আমি আমার গিন্নির কাছে দুখিলি পান চাই, দেখি শেষ পর্যন্ত কোনটা এসে পৌছায়।" একটা চাকর গোছের ছোঁড়াকে বাড়ীর মধ্যে জল এবং পানের কথা বলে পাঠিয়ে দিলুম। তার পরে দুজনে মুখ চাওয়া চাওই করে বসে থাকলুম। বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, কি জানি যদি মুখ রক্ষে না হয়। ঘোড়দৌড়ের মাঠেও বোধ করি এত উত্তেজনা হয় না। খানিক পরে চাকর ছোঁড়াটা দুখিলি পান নিয়ে চলে এলো। আমি একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে মোণ্টের মুখের দিকে চাইলুম, দেখি যে মণ্টে এতক্ষণ মিটি মিটি হাসছিল, সে বেশ চটেছে। ভাবলুম বিয়ে বাড়ীতে এভাবে ওকে চটান ভাল হয়নি। এখন একটা কাণ্ড না বাধালে বাঁচি। মুস্কিলের আসান একটু পরেই হল; শান্তি হাসতে

হাসতে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে হাজির। মোল্টে ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলে "এত দেরি হল যে?" শান্তি একই ভাবে হাসতে হাসতে জবাব দিল "কি করি বল, বিয়ে বাড়ীর হট্টগোল, গেলাস খোঁজরে, তাকে



মেজে ধুয়ে তবে কোথায় পরিষ্কার জল আছে তা দেখে শুনে আনতে হবে ত? সইয়ের আর কি, সাজা পান পড়ে ছিল চাকর ছোঁড়াকে বললে 'ওখান থেকে দুটো তুলে নিয়ে যা'—নবাবজাদি নিজে আসতে পারলেন না। আমাকে বলে পাঠালে আমি কক্ষণ ঐ পান দিতুম না, বিয়ে বাড়ীর ব্যাপার—পানগুলো না ধুয়েই নোংরা হাতে সেজে রেখেছে। এ

পান খেও না, আমি এক্ষুণি পরিষ্কার করে পান সেজে আনছি।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে "আচ্ছা অমন কুঁড়ে রামা বউ নিয়ে কি করে চলে আপনার? এতদিনেও একটু শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নিতে পারেন নি?" বলেই হন্ হন্ করে পান আনতে চলে গেল। মোণ্টে আমার পিঠ চাপড়ে বললে "কি ব্রাদার কে জিত্‌ল?" আমি হতাশ হয়ে বললুম "হার মান্‌লুম, দিল্লিকা লাড্ডু হজম করবার ক্ষমতা তোরই আছে।"



নাঃ আজকালকার ছোঁড়াগুলো হয়েছে যেন কেমন। বিয়ে করে এসে নতুন বউ নিয়ে এমন হ্যাংলাপনা বাপের কালেও দেখিনি। বাপ, দাদা, বাড়ীর পাঁচটা গুরুজনের সামনে অমন ধারা চৌপরদিন বউয়ের আঁচল ধরে বেড়ান—ছি ছি ভাবতেও ঘেন্না হয়! আবার ছু'তয় নাতায় অপিস কামাই করে দিনে দুপুরে দরজায় খিল দেওয়া! বউ যদি একটু শ্বাশুড়ির কাছে বসেছে কি অমনি বাবুর মাথা ধরল, শিগ্‌গির এসো মাথা টিপে দাও, কেনরে বাবু এত কাল কে তোর মাথা টিপত। বিয়ের পর বউ গিয়েছে বাপের বাড়ী, ভায়া আমার বিবাগী বললেই চলে। দুদিনেই তার চেহারা ঝোড়োকাকের মত হয়ে গেছে। মানুষের বউ মলেও এমন ধারা হয় না। নাওয়া খাওয়া ত ভুলেই গেছে, রাত জেগে জেগে চোখ বসে গেছে। তিন দিনেই একখানা আস্ত চিঠির প্যাড্ খতম। চিঠি ত নয় যেন এক এক খানা পার্শেল। সকাল সন্ধ্যে তার বৌদির পেছন

পেছন ঘুর ঘুর ক'রে তার পর টুপ করে একদিন ডুব মারল। ব্যাপার কি? গিন্নির কাছে খোঁজ নিয়ে জানলুম ভায়া গেছেন শ্বশুরবাড়ী চিঠি এসেছে নাকি বৌয়ের জ্বর। তা বাপু আমি ত' বড় ভাই রয়েছি আমাকে জানালেই পারতিস্। তোর বউয়ের জ্বর তা তুই তিন তাড়াতাড়ি গিয়ে কি করবি? গিন্নি তেরিয়া হয়ে বলেন—মিন্সে যেন দিন দিন ন্যাকা হচ্ছে, এ ব্যমো কি ডাক্তার বদ্যিতে ভালো করতে পারে? এই সেরেছে! এ তাহলে কি রকম ব্যমোরে বাবা! চুলোয় যাকগে, কলিকালের হাওয়াই বেয়াড়া। বউটাই বা কি রকম বেহায়া গা। জ্বরের ছুতো করে ডেকে পাঠায়? দুদিন পরেই ত আনতে যেতুম, একটু তর সইল না? বউ আর আনতে যেতে হল না, গুণধর ভাই আমার নিজেই সঙ্গে করে এনেছেন। ছি ছি এরা আমায় বিয়ের ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। আমারও ত এক দিন বিয়ে হয়েছিল আর পরীক্ষার সময় তিনমাস গিন্নিকে বাপেরবাড়ী রেখে দিব্যি লেখাপড়া করে পাশ করলুম; তোরা তা পারবি? স্রেফ পাগল হয়ে যাবি।

ছোট ভায়েরই বা দোষ দিই কেন? সেবার আমার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ কোলকাতায় এসে আমার বাসায় উঠলেন। শিয়ালদা ষ্টেশনে তাঁকে আনতে গেলুম। ট্রেন থেকে আমার শ্বাশুড়ি যখন নামলেন তখন আমার চক্ষু চড়কগাছে উঠেছে। তিনি ত ধরতে গেলে একাই এসেছেন কিন্তু সঙ্গে এনেছেন প্রায় এক ওয়াগন মোট-ঘাট। ভিড়ের চাপে জিনিষপত্র গাড়ীময় ছড়িয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। মালের মধ্যে বিছানা পত্র পানের বাটা লোটা জলের কুঁজো ইত্যাদি ছাড়া গোটা আষ্টেক "রসবতির কাঁঠাল", ঝুড়ি "ভুতোর আম", ডাব, নারকোল সজনের ডাটা, ওলের ডাঁটা, নটেশাক ইস্তক ঝাটার কাঠি পর্য্যন্ত সঙ্গে করে এনেছেন।

কোলকাতায় নাকি এসব জিনিষ পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। তা ছাড়া তাঁর মেয়ের হয়ত দেশের জিনিষ সব সময় খাওয়া হয়ে ওঠে না। কিন্তু তিনি ত বোঝেন না যে এদিকে ডুলি ভাড়ায় বৌ বিকিয়ে যাচ্ছে। যেখানে খালি হাতে এলে চার পয়সায় ট্রামে কি নিদেন ছ'আনায় রিকসা কার বাসায় আসতে পারতুম সে যায়গায় দুটাকা কুলি ভাড়া আর ছটাকা দিয়ে এক ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে বাসায় এলুম। তারপর বাসায় পা দিয়েই প্রথম ফরমাস "দাও ত বাবা একটা পোষ্টকার্ডে দুটো লাইন লিখে যে 'আমি ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছি', নইলে বুড়ো ওদিকে ভেবেই সারা হবেখন।" কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীর বাইরে পা দিতে না দিতেই ভাবনা সুরু!

কথা ছিল শাশুড়ী ঠাকরুণ মাস খানেক আমাদের বাসায় থাকবেন। প্রথম দুএক সপ্তাহ বেশ কাটল; ইতিমধ্যে শ্বশুর মহাশয়ের কাছে থেকে তিনখানা পত্র এসে গেছে, যতদূর শুনেছি তাতে খবরের মধ্যে 'ভোমলা গাই' তিনপো করে দুধ দিচ্ছে, কালো গাইটার ক্ষুরে ঘা হয়েছে, পাঁচখানা কাঁঠাল চুরি গেছে, কলার কাঁদিগুলো গেল হাটে ভাল দরেই বিকিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলুম আমার শাশুড়ি যেন একটু উস্ খুস্ করছেন, বাড়ীর জন্ম মন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শ্বশুর মহাশয়ের কাছ থেকে চিঠি আসতে দেরী হলে কর্ম্মব্যস্ত মেয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলতেন 'তাইত অনেক দিন খবর পাচ্ছি না, বাড়ীর সব কেমন থাকল কে জানে?' অন্যমনস্ক ভাবে মেয়ে জিজ্ঞাসা করে "কার কথা বলছ মা? দাদার কথা? তবে বৌদি, রাণী, বেলা? ও তাই বল, বাবার জন্ম মন কেমন করছে?" বলেই মুখে আঁচল দিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে। মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব্যস্ত-সমস্ত

ভাবে বলেন "ওরে চুপ কর মুখপুড়ি, জামাই শুনতে পেলে কি বলবে ?" যথাসময়ে সংবাদ জামায়ের কাণে পৌঁছায়। কিন্তু জামাই



বেচারা কি করবে ? গিন্নিকে বলি "তোমার মায়ের এখন যাওয়া টাওয়া হবে না। এসেছেন যখন তখন দু দশদিন থেকে গেলে সৃষ্টি রসাতলে

যাবে না।” গিন্নির আবার পেটে কোন কথা থাকে না, মায়ের খবর আমাকে জানাবে আবার আমাকে যে জানিয়েছে সেটা গিয়েও মাকে বলবে। ফলে শাশুড়ি ঠাকরুণ তাঁর হাবলা মেয়ের মুণ্ডপাত করে চাপ চুপ হয়ে গেলেন কেননা লজ্জায় তিনি হাওয়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী যাবার তাড়া দিতে পারছেন না। ওদিকে শ্বশুর মহাশয়েরও টনক নড়েছে। চিঠি এলো, সংসারের সব অগোছালো হয়ে পড়েছে, খাওয়া দাওয়ার নানান অসুবিধা, তাড়াতাড়ি চলে আসা প্রয়োজন। গিন্নি যখন কথাটা আমার কাছে পাড়লেন আমি বললুম “কেন রাণী, বেশ আছ, তা ছাড়া বৌদিই ত সংসারের সব কিছু দেখা শুনা করেন, শুনতে পাই তোমার মাকে কুটটি পর্যান্ত আজকাল নাড়তে হয় না, তবে আর কিসের জন্য সংসার অচল হয়ে পড়েছে ? তোমার মা বাড়ীতে থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি ?” গিন্নি কিছু ভেবে কুল করতে পারল না, তার মাকে গিয়ে আমার অভিমত জানাল। অগত্যা শাশুড়ি ঠাকরুণ আবার চুপ করে গেলেন। কিন্তু দুদিন পরে আবার পত্র এলো “আমি বুড় মানুষ একা পড়ে আছি, বেঁচে থাকলুম কি মলুম সেটা একবার খোঁজ নিলে না, তুমি ত দিব্যি জামায়ের বাড়ীতে ফুর্ত্তি করছ, বাড়ী ফেরবার নাম নেই। বেশ থাক তুমি মনের সুখে, আমি চললুম যে দিকে দুচোখ যায়।” শাশুড়ি ঠাকরুণ এবার সোজাসুজি আমাকে এসে ধরলেন “এবার আমাকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কর বাবা। ক'দিন থেকে ওঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, আমার এখন না গেলেই নয়।” আবার মিথ্যে অসুখের দোহাই! নাঃ বুড়-বুড়ীই যদি দু'দিন কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে না পারে তাহলে ছোট ভাইটা এমন কি দোষ করেছে ?



চোর কে?

নারকোলডাঙ্গায় কাঠের আড়ৎদার লছমিনারায়ণের গদিঘরের জাপানী ঘড়িটা বেশ্রী শব্দ করে এগারটা বাজল। আড়তের হিসাবরক্ষক ও খাজাঞ্চি রামরতন বাবু খাতার ওপর থেকে চোখ তুলে চসমার ফাঁক দিয়ে ঘড়িটাকে দেখেই নিজের মনে বল্লে "উঃ রাত এগারটা বেজে গেল।" ঘরে কিম্বা কাঠের গোলার ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় জন প্রাণী নেই কেবল দেউড়ি থেকে দারওয়ান শিউশরণের সুর করে রামায়ণ পাঠ কিছু কিছু ভেসে আসছিল। হাজার বার করে জাবেদা খাতায় ঠিক দিয়ে এবং তবিল গুনেও যখন রামরতন একটা টাকার গরমিল ধরতে পারল না তখন একরকম নিরাশ হয়ে এবং বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আড়তে খাতা লিখে সে চুল পাকিয়ে ফেলেছে কোন দিন একটা আধলার গোলমাল হয় নি আর আজ কি করে যে পুরো একটা টাকা তবিলে ঘাটতি পড়ল তা সে কিছুতেই ভেবে কুল কিনারা করতে পারলে না। কোন্ সকালে চারটি নাকে মুখে গুঁজে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, তারপর বেলা

বারটা পর্য্যন্ত সাত আট জায়গায় তাগাদায় যেতে হয়েছিল এখন এই রাত এগারটা পর্য্যন্ত ঠায় উবু হয়ে তক্তপোষটার ওপর বসে ক্রমাগত একবার জাবেদায় ঠিক দিচ্ছে একবার তহবিল গুনে দেখছে। এই বৃদ্ধ বয়সে তার চোখে যেটুকু জ্যোতি ছিল তাতে মোটা কাঁচের চসমার সাহায্যে কোন রকমে করে খাচ্ছিল কিন্তু তাও বোধ হয় আজকের হিসাব মেলাতেই হারাতে হবে। রামরতনের টেকো মাথা বেশ গরম হয়ে উঠেছে, রগদুটো বেজায় যন্ত্রনা করছে, পিঠের দাঁড়া, হাঁটু, ঘাড় অসহ্য বেদনায় টন টন করছে; এর ওপর আবার ট্রাম, বাস বন্ধ বলে এত রাতে হেঁটে বাসায় যেতে হবে সেও আবার বেলগেছিয়ায়, পাইকপাড়া লেনে। আড়তদার লছমিনারায়ণ হয়ত টাকাটার কথা শুনলে গ্রাহ্যই করত না, কেননা সে নিজে লাখ টাকার মালিক এবং রামরতনও তার স্বর্গীয় পিতা সুন্দরী-লালের আমলের অতি বিশ্বস্ত সরকার। কিন্তু রামরতন তার পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার সম্মানকে কিছুতেই খাট করবে না বলে এত উঠে পড়ে লেগেছিল। যখন দেখলে যে কিছুতেই কিছু হবার নয় তখন রামরতন তার মাথা বেড় দিয়ে সুতোয় বাঁধা চসমাটা খুলে ভাঙ্গা খাপটার মধ্যে ভরে ফেললে। তারপর দেওয়ালের গায়ে বসান সিন্দুকটার মধ্যে ক্যাশটা সযত্নে রেখে সেটা বন্ধ করে ডবল চাবি তালা ইত্যাদি লাগিয়ে দিয়ে বার বার করে তা পরীক্ষা করে নিলে। খাতা-পত্র গুলো শেলফের ওপর যথাস্থানে তুলে ফেলল। অবশেষে পকেট থেকে টিনের তোবড়ান একটা কৌটা বার করে খুলে তার থেকে টিপে টিপে বাছাই করে একটা বিড়ি তুলে নিল। সেই কৌটার মধ্যে দু'একটা প্রয়োজনীয় কাগজ একটা ট্রামের কুপন এবং কয়েক আনা পয়সা ছিল। বিড়িটা ধরিয়ে সজোরে একটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দারওয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁক দিল "শিয়াশরণ!"

দারওয়ান রামায়ণ পাঠ বন্ধ রেখে জবাব দিল 'হুজৌর', এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়ম পায়ে খটাস্ খটাস্ করে রামরতনের সামনে হাজির হল। রামরতন সিন্দুকের চাবিটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে বললে "আমি চল্লুম রে, গদ্দিঘর ভাল করে বন্ধ করে দে।" দারওয়ান উত্তর দিল "জি হুজুর।" তারপর জিজ্ঞাসা করল "এত্তা রাত হো গইল, টিরেম, বাস সব বঁধ হো গইল বা কইসে ঘর যাই ?" রামরতন ক্লান্তির সুরে জবাব দিলে হেঁটেই যাব বাবা—কি করি, এত বড় হিসেব যে কিছুতেই শেষ হয় না, কাল আবার সকাল করে আসতে হবে।" রামরতন মতলব করেছিল যে বাড়ী থেকে একটা টাকা এনে আড়তদার কিম্বা আর কেউ আসবার আগেই ক্যাশ পুরিয়ে দিয়ে রাখবে।

পরদিন যেমন টাকা গচ্ছা দিল তেমনি আবার বারকয়েক হিসেবটা মিলিয়ে নিলে যদি গরমিলটা ধরা পড়ে যায়। রামরতন দিন রাতই ভাবে টাকাটা গেল কোথায় ? কাগজের নোট বলে কি হাওয়ায় উড়ে গেল ? উঁহু এত অসাবধান রামরতন নয়। তবে হয়ত একটা কিছুতে খরচ হয়েছে অথচ লেখা হয়নি—কিন্তু এত ভোলা-মন সে ত নয়। তাহলে নিশ্চয়ই চুরি গিয়াছে। তাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে ? বিশ ত্রিশ হাজার নগদের মধ্যে থেকে মাত্র একখানি একটাকার নোট চুরি করবে কোন আহাম্মকে ? তাছাড়া চুরিই বা করে কি করে, দেয়ালের ভেতর সিমেণ্ট করে বসানো সিন্দুক, সামনে দরজায় দুটো চাবি একটা তালা, চুরি করাটা এত সহজ নয়।

বৃদ্ধ রামরতন বেচারা সবে একটাকার শোক ভুলবার চেষ্টা করছিল আর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই আবার তহবিলে একটা টাকা ঘাটতি পড়ল। ঘটনার আগের দিন বিকালে তহবিল মিলিয়ে সিন্দুক বন্ধ করে গিয়েছে

আর সে দিন সিন্দুক খুলে প্রথম ক্যাস মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বুড়ো টাকে হাত দিয়ে বসল। এ চুরি ছাড়া যায় না। রামরতন চুরির কথা আড়তদারকে বলতে গিয়ে থমকে গেল। ভাবল হয়ত আড়তদার হেসেই উড়িয়ে দেবে। এক টাকার ঘাটতিকে চুরি বলেই বা কি করে বিশ্বাস করে? হয়ত ভাববে সরকার বুড়ো হয়ে ভুলচুক করতে আরম্ভ করছে। অগত্যা রামরতন ব্যাপারটা চেপে গিয়ে গাঁট থেকে আর একটাকা গুচ্ছা দিল এবং সেই সঙ্গে হিসাবগুলি বেশ করে মিলিয়ে নিতে ভুলল না। সে দিন মনে মনে সংকল্প করে ফেলল যে ফের যদি তবিল ঘাটতি পড়ে তাহলে আড়তদারকে নিশ্চয় বলবে; কাঁহাতক আর গচ্ছা দিয়ে পারা যাবে?

তিন দিন পরে রামরতন বাইরের তাগাদা শেষ করে সিন্দুক খুলে তবিল মেলাতে গিয়ে দেখে এবার আর এক আধ টাকা নয় একেবারে দশ টাকার একখানা নোট গাপ্ হয়ে গেছে। এক টাকা করে চুরি তবু যদি বা গায়ে সইছিল এখন টাকার অঙ্ক বাড়তে দেখে রামরতন রীতিমত ঘামতে সুরু করল। সে কাঁপতে কাঁপতে আড়তদার লছমিনারায়ণের কাছে গিয়ে তবিল ঘাটতির কথা বলল এবং সেই সঙ্গে আগের দুটি ঘটনাও বলল। আড়তদার দু'দশ টাকা নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক নয়, বলল "দেখুন নিশ্চয় কোথায় খরচ টরচ হয়েছে" কিন্তু রামরতন যখন বার বার করে জানাল যে সব খরচই লেখা আছে একটাও বাদ পড়ে নি তখন লছমিনারায়ণ হাসতে হাসতে পকেট থেকে বারটা টাকা বার করে রামরতনকে দিয়ে দিল এবং এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে দিল না।

পরদিনই আবার দশটাকার দুখানা নোট উধাও হল। রামরতন মরিয়া হয়ে লছমিনারায়ণকে জানিয়ে দিল যে এ চুরি বন্ধ না করলে সে

আর চাকৃরি করবে না। আড়তদার দেখল আর ত চুপ করে থাকা চলে না, কোথাও একটা কোন গোল চলছে। সে দিন আড়তদার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ক্যাস মিলিয়ে নিল এবং সিন্দুক নিজে বন্ধ করে চাবিগুলো



নিজের কাছেই রাখল, এ ছাড়া দারওয়ানকে সারারাত পাহারায় নিযুক্ত রাখল। কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও পরদিন তহবিলে পুনরায় দশ টাকার নোট কম পড়ল। রহস্যটা ক্রমেই জোরাল এবং ঘোরাল হয়ে পড়ল। লছমিনারায়ণ পুলিশে খবর দিল। পুলিশের লোকের বুদ্ধি ত আরো মোটা। তারা এসে জেরা করল "কাকে কাকে সন্দেহ হয়?" কিন্তু সন্দেহ কার ওপরই বা করা চলে? সুতরাং লছমিনারায়ণ জানাল যে সন্দেহের কারণ যদি পাবে তাহলে আর পুলিশের শরনাপন্ন হতে যাবে কেন? পুলিশের লোক নিজেরাই একরাত পাহারা দিল ফলে সে রাত্রে একশ টাকার একটা নোট খোয়া গেল। লছমিনারায়ণ মহা ব্যস্ত হয়ে

পড়ল, পুলিশের লোক কম বেকুব হল না, কিন্তু চুরির কিনারা ত একটা করতেই হবে নইলে তাদের চাকরি থাকবে না ; রামা, শ্যামা যাকে হোক ধরা চাইই ; কিন্তু ক্রমান্বয়ে রামা শ্যামাকে ধরলে ত আর চুরি বন্ধ হবে না। এ ত' প্রতি রাত্রেই চলবে। গভর্ণমেণ্ট যে ভূতে বিশ্বাস করে না, নইলে ভৌতিক বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। অথচ একে ভৌতিক ছাড়া আর কি বলা যাবে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সামনে থেকে চুরি করবে এ রক্তমাংসের শরীরের মানুষের দ্বারা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

উচ্চ কর্ম্মচারিদের কাছে খবর গেল। ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টের কয়েকটী কর্ত্তা এলেন, একজন ফিঙ্গারপ্রিণ্ট এক্সপার্ট এলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সিন্দুকের আশপাশ, কাঠের গোলার চারিধার পরীক্ষা করা হল কিন্তু চুরির হদিস্ কিছুই মিলল না। লছমিনারায়ণ দেখল চুরির কিনারা করা পুলিশের বাবার অসাধ্য, অথচ টাকা গুলি এখানে রাখাও আর নিরাপদ নয় কিন্তু সিন্দুক ছাড়া নিরাপদ স্থান কোথায় হতে পারে ? শেষে অনেক ভেবে এক রাজমিস্ত্রি ডেকে আনিয়ে হুকুম দিল আপাততঃ সিন্দুকটা ও স্থান থেকে সরিয়ে তার বাড়ীতে শোবার ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে দিতে হবে। কাজ সুরু হয়ে গেল। পুলিশের লোক তাদের কাজে বাধা পাচ্ছে বলে বিদায় নিল। রামরতন একটা টুলের ওপর বসে মিস্ত্রির কাজ দেখতে লাগল। সিন্দুকটা আস্তে আস্তে দেয়ালের ভিতর থেকে বার করে আনা হল। এটির সামনের দরজা ছাড়া আর সব মোটা সেগুন কাঠের তৈরী—বহুকালের পুরনো সিন্দুক অথচ কিছুই হয় নি বললে চলে কেবল মিস্ত্রি বলল "এই পাশের কোনটা ইঁদুরে কেটেছে দেখছি।" রামরতন লাফিয়ে উঠে বলল "এ্যাঁ ইঁদুরে সিন্দুক কেটেছে, কই দেখি

কোনখানটায়?" তারপর সিন্দুকটা ভাল করে পরীক্ষা করে ছুটে গেল দেওয়ালের কাছে যেখানে ওটা বসান ছিল। মিস্ত্রিদের বলল সে যায়গার রাবিশগুলো বার করে ভাল করে পরিষ্কার করতে। ছোট কোদাল দিয়ে রাবিশ টেনে বার করবার সঙ্গে কয়েকটা নোট বেরিয়ে পড়ল। রামরতন আবার লাফিয়ে উঠল। সে ছুটে গেল লছমিনারায়ণের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল "হুজুর চোর পাকড়েছি।" লছমিনারায়ণ হাঁ হাঁ করে উঠল "দেখেঁ শালা কোন আছে।" রামরতন সমান উত্তেজনার মধ্যেই বলল "হুজুর—ইঁদুর—চুয়া।"

চোর দলবদ্ধ ভাবে ধরা যায়নি, লাঠির খোঁচায় মাত্র একটা প্রাণত্যাগ করেছে। টাকা সবই উদ্ধার হয়েছে তবে কোন্‌টার অর্দ্ধেক নেই—কোনটার কোনা চিবান অবস্থা। আরও খবর পাওয়া গেছে যে ইঁদুরের চালাটি অনেক লম্বা এবং তৈরী শেষ হতে বহুকাল সময় লেগেছে।



রোমান্স

দু'মাস যেতে না যেতেই সরকার থেকে আবার দার্জ্জিলিং যাবার নির্দ্দেশ পেলুম। ভারী বিরক্ত লাগল, কাঁহাতক আর বার বার দার্জ্জিলিং যাওয়া যায়। তার আগে গরমের সময় গাঁটের পয়সা খরচ করে দার্জ্জিলিং ঘুরে এসেছি; তখন ত' আর জানতুম না যে পরে সরকারি কাজে আমাকেই একাধিকবার ঐ জায়গায় যেতে হবে। সরকারের গোলাম, সুতরাং যেতে যখন হবেই তখন বিরক্ত হওয়া শোভা পায় না। তারপর ঘরে আমার নব্য-বিবাহিত (অর্থাৎ বছর পেরোয়নি)

সুন্দরী স্ত্রী ছেড়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা। বার বার 'টুর' করতে হয় বলে গৃহিণী মুখ ভার করেন। আপনারা হয়ত বলবেন সঙ্গে নিয়ে গেলেই ত' ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার যে কত ঝঞ্ঝট সেটা শুধু ঘরে বসে টিপ্পনী কাটলে ঠাহর করা যায় না। তাছাড়া পথের রোমান্সগুলো আবার ফস্কে যায়। কথাটা ঠিক বোধগম্য হল না বোধ হয়! যাঁরা ট্রেনে করে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন অথবা যাঁরা রোমান্সের সন্ধানে থাকেন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে, জীবনের শতকরা নিরেনব্বই ভাগ রোমান্স পাওয়া যায় এই ট্রেনে অথবা বিদেশে। গিন্নি অথবা গুরুজন সঙ্গে নিয়েছ কি মরেছ। এই ট্রেনে ভ্রমণ করে আমার জীবনে যত রোমান্সের সন্ধান পেয়েছি তাতে করে অনেক উপন্যাস আর গল্প লেখা চলে, কিন্তু ফ্যাকড়া বাধিয়েছে আমার সুন্দরী স্ত্রী; রোমান্সের গন্ধ পেলেই একদম ঠিকরে বাপের বাড়ী চলে যাবে। পূজার বাজারে গল্প লেখার তাগিদ অনেক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছি অথচ রোমান্সহীন গল্প আর কত লিখে পারা যায়, তাই মনে করছি এই হট্টগোলের মধ্যে আমার জীবনের দু'একটা রোমান্টিক ঘটনা চালিয়ে দেওয়া যাক, হয়ত গিন্নির নজরে পড়বে না।

সরকারি কাজে ট্রেনে ভ্রমণ করতে হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া পাই কিন্তু কিছু লাভ রাখবার জন্য মধ্যম শ্রেণীতে ভ্রমণ করি। অসম্ভব ভীড়ের মধ্যে একটু বসবার যায়গা করে নিতে পেরেছিলুম, কিন্তু পয়সা বাঁচাতে গিয়ে রাত্রে শোয়াটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। আমার ঠিক সামনেই, মাঝখানের বেঞ্চে বসেছিলেন একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক আর একটি সতের আঠার বছরের তরুণী,

কপালে সিঁদুর। ভদ্রলোক নিজেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। দামি সিগারেট কেস্ এগিয়ে দিয়ে ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট 'অফার' করলেন—তারপর কোথায় যাচ্ছি, কোথায় গিয়ে উঠব, কতদিন থাকব ইত্যাদি নানান প্রশ্ন জুড়ে দিলেন। আমিও সেই ফাঁকে দু'একটা প্রশ্ন করে তাঁদের পরিচয় যা জানতে পারলুম তা হচ্ছে যে, ভদ্রলোকের নাম বীরেন চক্রবর্ত্তী কোলকাতায় কালোবাজারে নানান্ রকম ব্যবসা করে বিস্তর পয়সা করেছেন, সম্প্রতি ব্যবসা উপলক্ষ্যে সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং চলেছেন। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক তাঁর স্ত্রীও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা শুনছিলেন। ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গল্প চলেছিল, তারপর ক্লান্তি বোধ করতে লাগলুম, দু'চারটে হাই তুলে বসে বসেই একটু ঘুমবার চেষ্টা করলুম। গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীদেরও খানিক আগে পর্য্যন্ত বেশ উৎসাহের সঙ্গেই গল্প চলছিল এখন সবাই ঢুলতে সুরু করেছে। ঈশ্বরদি ষ্টেশনে পাবনা-যাত্রী এক বৃদ্ধা ও তাঁর পুত্র বিস্তর মোটঘাট নিয়ে নেমে পড়লেন। তাঁরা বীরেনবাবুর স্ত্রীর পাশেই বসেছিলেন, উঠে যেতে অনেকখানি জায়গা খালি হ'ল। বীরেনবাবু ধাঁ করে তাঁর গোটানো সতরঞ্চিটা সমস্ত স্থানটুকু জুড়ে বিছিয়ে ফেলে আমাকে বললেন, "আসুন এই বেলা শুয়ে পড়ুন, নইলে সমস্ত রাত ঠায় বসে কাটাতে হবে।" আমি বাধা দিয়ে বললুম, "সে কি হয়, আপনাদের দু'জনেরই শোবার জায়গা হবে না, আবার আমায় ডাকছেন কি করে।" নাছোড়বান্দা বীরেন, বাবু আমার হাত ধরে জোর করে তুলে নিয়ে তাঁর স্ত্রীর পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন "আরে মশাই আমার কি ঘুমুলে চলে, কতদিকে খেয়াল রাখতে হয়। আপনি শুয়ে পড়ুন ত।" আমি তাঁর স্ত্রীকে

লক্ষ্য করে বললুম "আপনার কি মাথা খারাপ হল? মিসেস্ চক্রবর্ত্তী বসে থাকবেন আর আমি কোন আক্কেলে শোব?" মিসেস্ চক্রবর্ত্তী নিজেই জবাব দিলেন, "আমি শোবার হলে অনেক আগেই শুতাম, আপনাদের ডাকতাম না, কিন্তু ট্রেনে আমার মোটেই ঘুম পায় না, আপনি কিছু ভাববেন না, শুয়ে পড়ুন।" অগত্যা তর্ক নিষ্ফল দেখে মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর দিকে মাথা করে অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে শুলুম। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়ে পড়ে থাকবার পর চোখ খুলে দেখি, বীরেনবাবু উঠে গিয়ে আমার পরিত্যক্ত জায়গায় বসে জানলার উপর মাথা রেখে দিব্যি ঘুমুচ্ছেন আর মিসেস্ চক্রবর্ত্তী আমার মাথার কাছে বসে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে চোখ খুলতে দেখে একটু হেসে বললেন, "ঘুম আসছে না বুঝি?" আমি বললুম, "কি করে ঘুম আসবে? আপনার স্বামী ত' বললেন, তাঁর ঘুমুলে চলে না, অথচ দিব্যি জানালার ওপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছেন। বাকি গাড়ীসুদ্ধ অন্য সকলেও ঢুলছে—কেবল আপনি মাথার কাছে জেগে বসে আছেন।" মিসেস্ চক্রবর্ত্তী আবার তেমনি হেসে বললেন, "নাঃ আপনি বড্ড সেন্টিমেন্টাল, নিন্ আর ছেলেমানুষি করবেন না, ঘুমিয়ে পড়ুন।" অগত্যা আবার চোখ বুজিয়ে ধ্যান করতে লাগলুম। বোধ হয় মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর মুখ। তাঁর ওপর যেন কেমন একটা মায়া জন্মে গেল। মনে হ'ল যেন দিদির কোলের কাছে মাথা রেখেছি। দিদি যেন আদর করে অমোর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন। আঃ ভাবতে ভারী আরাম লাগল, মনে হ'ল যেন সত্যই কে আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কেমন খট্‌কা লাগল—তাইত সত্যই কে যেন হাত দিয়েছে আমার মাথায়! চোখ খুলতে সাহস হ'ল না,

যদি মিথ্যা হয়, যদি হাত সরিয়ে নেয়! চোখ বন্ধ করেই অনুভব করতে লাগলুম, মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর সরু আঙ্গুলগুলি আমার চুলের মধ্য দিয়ে খেলে যাচ্ছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব কেমন গুলিয়ে গেল, কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝলুম না। মিসেস্ চক্রবর্ত্তী আমার মাথায় হাত বোলাতে যাবে কেন? কোন কুমতলব নেই ত' রে বাবা। ভারী ভয় করতে লাগল। মনে মনে গিন্নিকে স্মরণ করলুম। রোমান্সের লোভে শেষকালে লোপাট না হয়ে যাই! আবার মনে হ'ল তাই বা হতে যাবে কেন? হয়ত মিসেস্ চক্রবর্ত্তী সত্যিই আমাকে ছোট ভাইটির মত স্নেহ করছেন, চেষ্টা কচ্ছেন ঘুম পাড়াবার—এইটাই বরং স্বাভাবিক। নারী জাতটার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধায় সমস্ত মনটা ভরে গেল। কত স্নেহ ভালবাসা এদের বুকের মধ্যে আছে, দেবার লোক পেলে এরা মন উজাড় করে সমস্ত ভালবাসা স্নেহ নিবেদন করতে পারে, কিন্তু যাকে দেবে সে যদি যোগ্যপাত্র না হয় তাহলেই সব গেল। পুরুষ মানুষকে একটু নাই-দিলে অমনি মাথায় ওঠে কি না! মনে মনে ঠিক করলুম, এ পবিত্র স্নেহের অবমাননা কিছুতেই করব না। আস্তে আস্তে হাতটা মাথার কাছে নিয়ে গিয়ে মিসেস্ চক্রবর্ত্তী হাতখানা ধরে ফেললুম। হাতছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না। গালের ওপর গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলুম—তারপর মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন, "এখনও ঘুমাও নি?" চোখ না খুলেই বললুম, "ঘুম যে আসছে না।" তারপর আর কোন কথা হয় নি। একই ভাবে হাতের মধ্যে হাত রেখে বহুক্ষণ কেটে গেল। হয়ত একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলুম। জলপাইগুড়ি পৌঁছবার আগেই উঠে বসলুম। মিসেস্ চক্রবর্ত্তীর দিকে চাইতেই দেখি তাঁর ঠোঁটে একটু হাসি লেগে আছে। বীরেনবাবুরও ঘুম ভেঙেছে। তিনিই

চা জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। শিলিগুড়ি পৌঁছে দেখি ভীষণ ব্যাপার। গাড়ী কম, যাত্রী অনেক; তারমধ্যে বেশিরভাগ মিলিটারী। আমি এবার মধ্যম শ্রেণী না থাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠে বসলুম। বসবার স্থান ছ'জনের অথচ আমরা ছিলুম পাঁচজন; তিনজন এ্যামেরিকনে অফিসার, একজন বাঙ্গালী অফিসার আর আমি। একটু পরেই দেখি বীরেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে আমার গাড়ীর সামনে এসে বললেন, "বেশ ত' মশাই দিব্যি কেটে পড়লেন, আর এদিকে আমি আপনাকে গরুখোঁজা করছি। যাক্ এখন থার্ডক্লাসে ত' মোটেই যায়গা নেই—ভুটিয়া, নেপালী আর মিলিটারীতে ভর্ত্তি। বিটকেল গন্ধে মশাই কাছে ঘেষবার জো নেই, তাই রমাকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি আর আমি কোন রকমে দাড়িয়ে থার্ডক্লাসে যাবো'খন, তবু কিছু পয়সা বাঁচবে।" বলেই রমাকে অর্থাৎ মিসেস্ চক্রবর্ত্তীকে আমার কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে টিকিট বদল করতে ছুটলেন। আমি মাঝখানের দিকে সরে গিয়ে জানালার ধারে বসবার যায়গা করে দিলুম। রমা আবার তেমনি হেসে মৃদুকণ্ঠে বললে, "আবার তোমাকে বিরক্ত করতে এলুম, হয়ত ভাবছ মেয়েটা কি বেহায়া, না?" আমি এরকম প্রশ্নে মোটেই অভ্যস্ত ছিলুম না, তাড়াতাড়িতে জবাব দিলুম, "না না ছিছি বিরক্ত হতে যাবো কেন? আপনি এলেন, বরং আনন্দই হ'ল।" রমা মুখ ঘুরিয়ে বললে, "আনন্দ না ছাই, তাহলে ট্রেন থেকে নেমেই আর গা-ঢাকা দিতে না।" তারপর আবার আমার দিকে ফিরে বললে, "সত্যি বল না, আমার ব্যবহারে তুমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ না? সত্যিই আমি এ দুর্ব্বলতার জন্য খুব লজ্জিত, তুমি পার ত' আমাকে ক্ষমা করো।" আমি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লুম, বললুম, "আরে না না, আমি মোটেই রাগ করিনি আপনি এ সব কথা

বলে আমাকে ভারী লজ্জা দিচ্ছেন। যদিও আপনি বয়সে ছোট তবু আমি আপনাকে দিদির মত ভক্তি করি, স্নেহ করি'—আলোচনা বেশি বাড়ান সম্ভব হ'ল না, কারণ এ্যামেরিকানরা আমাদের কথা না বুঝলেও বাঙ্গালী অফিসারটির নজর আমাদের উপর পড়েছে দেখলুম। রমাকে ইঙ্গিতে অবস্থাটা জানিয়ে দিয়ে অন্য বিষয় আলোচনা সুরু করলুম। ট্রেন ছাড়ল। বাঙ্গালী অফিসারটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললুম। ভদ্রলোকের নাম ক্যাপ্টেন সুরেশ বোস, জমিদারের ছেলে, পয়সাওয়ালা লোক। দার্জ্জিলিং এ বেড়াতে চলেছেন। ক্যাপ্টেন বসুর সবই আমার কাছে ভালো লাগল, কেবল ঐ মাঝে মাঝে রমার দিকে চেয়ে দেখাটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলুম না। রমার মুখে কিন্তু একই রকম হাসি লেগে আছে। কোন রকমে রাগটা চেপে গেলুম। রমা এবং ক্যাপ্টেন বসু দু'জনেই দার্জ্জিলিং এর পথে নতুন যাত্রী সুতরাং বাকি পথটা পাহাড়ের রাস্তা আর রেল লাইনের বিবরণ দিতে দিতে চললুম। দার্জ্জিলিং পৌঁছে যে যার পথে সরে পড়লুম, ঠিক হ'ল 'মলে' দেখা করব। অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম বলে সেদিন আর বেরুতে পারিনি, তারপর দিন অফিসের কাজে বিকেলটা নষ্ট হ'ল। এদিকে 'মলে' যাবার জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। তিন দিনের দিন যাঁদের বাড়ীতে উঠেছিলুম, তাঁরা ধরে বসলেন সিনেমা যেতে হবে। কিছুতেই এড়াতে পারলুম না, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হ'ল সিনেমা। তারপর দিন ঠিক করলুম যেমন করেই হোক্ আজ একা বেরিয়ে পড়ব যদি রমার দেখা পাই।

চৌরাস্তায় এসে কয়েকজন পুরনো বন্ধু ছাড়া আর কারো সাক্ষাৎ পেলুম না। রমার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম যে, বন্ধুদের সঙ্গে ভালো

করে আলাপ পর্য্যন্ত করতে পারলুম না। নিতান্ত অভদ্রের মত তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অবসারভেটার হিলের পাশ দিয়ে একটা চক্কর দিলুম। মাঝ পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'ল। রাস্তার ধারে লেবংএর দিকে মুখ করে বেঞ্চের ওপর বসে আছে রমা আর তার পাশে ক্যাপ্টেন বসু। রাগে ঘৃণায় সমস্ত শরীর রী রী করে উঠল। রমা আমাকে দেখতে পেয়ে বসুর কানে কানে কি যেন বলল, এবং সে শয়তানটা আমাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে টলতে টলতে এসে বললো "হ্যলো, হ্যলো, অনেক দিন বাঁচবে ব্রাদার, এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল", বলেই আমার কাধে একটা হাত রাখল। মুখ দিয়ে তার ভুর ভুর করে মদের গন্ধ ছাড়ছে। আমি এক ঝটকায় তার হাত সরিয়ে দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে উঠলুম, "ছেড়ে দাও আমাকে রাস্কেল, যেখানে ছিলে সেইখানে গিয়ে বসো, আমাকে বিরক্ত করো না।" এইভাবে অপমানিত হয়েও সে আবার আমার কাছে সরে এসে অত্যন্ত করুণ সুরে বললে, "আহা চটো কেন ব্রাদার, রমা দেবীর কাছে সবটা শোনই আগে তারপর যা ইচ্ছে ব'লো। আমাকে যতটা লোফার ভাবছ আমি তা নই। রমা দেবীকে আমি এখানে সঙ্গে করে আনিনি, বরং ওই আমাকে এই অসময় আমার হোটেল থেকে টেনে বার করেছে, কি-না-কি বিপদে পড়েছে বলছিল, আমার সাহায্যের দরকার ; তোমাকে পেলে ও নাকি আমাকে বিরক্ত করত না।" কিছুই ভাল লাগছিল না, মাতালের পাল্লায় পড়েছি এমনিতে ছাড়বে না তাই আর কথা না বাড়িয়ে নিজের রাস্তা ধরলুম। দু'পা যেতে না যেতেই জামায় টান পড়ল, আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে আমার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রমা প্রশ্ন করল, "রাগ করে কোথায় যাচ্ছ শুনি, আমার সব কথা

না শুনে তুমি যেতে পারবে না, কোই যাও ত' দেখি কেমন করে যাবে ?" বলে আমার হাত ধরে এক রকম হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল বেঞ্চের ওপর।

ক্যাপ্টেন বসু হাত তুলে অভিবাদন জানল, "চললুম তা'হলে. গুড্‌নাইট, গুড্‌লাক্ !" আমি অন্যদিকে তাকিয়ে মুখ হাঁড়ি করে থাকলুম। রমা দুই হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললে, "অভিমান করেছ না ? বোকা ছেলে। আমাকে না তুমি ভালবাস ?" রাগ করেই জবাব দিলুম, "হ্যাঁ বাসতুম, বোনের মত অন্য কিছু ভেবে নয়।" রমা আরো কাছে সরে এসে মুখের কাছে মুখ এনে বললে, "রাবিশ, ওসব বোন টোনের কথা বাড়ী গিয়ে ভেব। এখন এই জোৎস্না রাত্রে নির্জ্জন পাহাড়ে আমি তোমায় শোনাব ভালবাসার কথা, প্রেমের গান।" ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিয়ে বললুম, "তার জন্য ক্যাপ্টেন বসু ত' ছিলই, তাকে ছেড়ে দিলে কেন ? বেশ পয়সাওয়লা লোক। আমি সামান্য কেরাণী, তায় সাহিত্যিক—জমিদারিও নেই, উপরিও নেই, ঘরে আবার একটি স্ত্রীও আছে, আমার ত' বাপু ও সব প্রেম-ট্রেম ধাতে সইবে না। আর তাছাড়া তোমার না স্বামী আছেন, তাঁকে ত দেখছি না।"

রমা তার ঠোঁট দুটি প্রায় আমার ঠোঁটের কাছে এনে বললে, "তুমি আমাকে এতটা অপমান করতে পারলে ? তোমার মনে কি একটু দয়া মায়া নেই ? আমাকে তুমি এত নীচ ভাব ? না না, ভুল কর না লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোন। স্বামীর কথা বলছিলে, যদিও স্বামী নিন্দা করতে নেই তবু না বলেও উপায় নেই, তিনি ইদানিং এত মদ ধরেছেন যে তাতে তাঁর ব্যবসা ত নষ্ট হয়ে গেছেই তার ওপর আমার যা দুচারগাছি গহনা ছিল তাও কেড়ে নিয়েছেন, আপত্তি করতে

গিয়ে মার খেতে হয়েছে কম নয়, এই দেখ এখনও তার দাগ রয়েছে।" বলে অন্ধকারে কি যে দেখালো কিছুই টের পেলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম "তা তোমারও ত উচিত স্বামীকে সৎপথে নিয়ে আসা, তা না করে উল্টে মদের পয়সা জোগাচ্ছ?" রমা ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর দিল "না দিলে যে মারে, বাড়ীর থেকে বার ক'রে দেয়; কোথায় যাই বল?" তারপর হঠাৎ আবার জড়িয়ে ধরে বললে "একটা কথা বল্‌ব, রাগ করবে না ত?" কোথাকার জল যে কোথায় দাঁড়াবে বুঝলুম না, সহজে রেহাই পাব না নিশ্চিত জানি তা বলে রমার কাছে কোন মতেই হার মানব না, মনটাকে শক্ত করে নিয়ে বললুম "কি বল।" রমা আদরে গলে গিয়ে বলল "গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে পার, আজ টাকা না নিয়ে যেতে পারলে আমার কপালে যে কি দুর্ভোগ আছে তা ভাবতেই পারছি না।" কটা টাকার ওপর দিয়ে এ যাত্রা রক্ষা পাব মনে করে দিয়ে দিলুম পঞ্চাশটা টাকা। রমা ভারি খুশি হয়ে উঠে পড়ল তারপর আমার মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে "সত্যিই তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। কাল রাত্রে এইখানে দেখা করো, তোমাকে সারারাত গান শোনাব, যা চাও তাই দেব।" মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরে গেল। রমা আমাকে ফেলেই চলে গেছে। আমি আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখলুম। তাইত এ কোথায় চলেছি আমি, শেষে রোম্যান্স করতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হব! উঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত দুর্ব্বলতাকে ঝেড়ে ফেললুম। রমার চরিত্র আমার কাছে হেঁয়ালি রয়ে গেল। বুঝলুম না সে কি সত্যিই বিপদে পড়ে টাকা নিল না টাকার বিনিময়ে সে কিছু দিতেও পারে।

দার্জ্জিলিংয়ের মত জায়গায় মাথাটা গরম হয়ে থাকল, সারারাত ঘুমুতে পারি নি। পরদিন আমার কোলকাতায় ফিরবার কথা ছিল কিন্তু রমা

আসলে যে কি তা না জেনে কিছুতেই দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করতে পারলুম না। তানানা করে দুপুরটা কাটিয়ে দিয়ে বিকেলেই চলে গেলুম ক্যাপ্টেন বসুর হোটেলে। বসু তখন সবে সন্ধ্যাটাকে রঙ্গিন করবার



আয়োজন করছিলেন, আমাকে দেখেই একটি গ্লাস এগিয়ে দিলেন। আমি বললুম "মাপ করবেন ওটি আমার চলে না।" তারপর দুচার কথায় রমার

কথা উঠল। ক্যাপ্টেন বসু টেবিল চাপড়ে বললেন "বাই দি বাই, বীরেন বাবু তার সো-কল্ড স্ত্রীকে নিয়ে আজকের মেলে দার্জ্জিলিং ছেড়ে গেছে। মাঝখান থেকে আমার একশটি টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল, কাল দুচার পেগ্ বেশি পেটে গিয়েছিল, মাথাটা পরিষ্কার ছিল না, রমা কি মায়া কান্না কাঁদল, দিয়ে দিলুম একশটা টাকা! এখন দেখছি স্রেফ ধাপ্পা। শালারা স্বামী স্ত্রীর অভিনয় দেখিয়ে বেশ পয়সা রোজগারের ফন্দি বার করেছে। আমি দুনিয়ার কত দেশ ঘুরে এলুম, মেয়ে মানুষের কত রকম চালাকি দেখেচি তবে নিজের দেশে এসে এতটা উন্নত ধরণের খেলা দেখতে পাব এটা ধারনা করি নি। বেশ ঠকিয়েছে আমাকে, আপনার কিছু খসিয়েছে নাকি?" আমি একটা ঢোক গিলে বললুম "আজ্ঞে না, আমি তেমন কাঁচা ছেলেই নই।" আর বসে থাকা নিস্প্রয়োজন দেখে উঠে পড়লুম। মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। একটা মেয়ে মানুষ যে এতদূর শঠ প্রবঞ্চক হতে পারে তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। বাসায় ফিরে না গিয়ে মলের ধারে সেই নির্জ্জন বেঞ্চটার ওপর বসলুম। আগের রাত্রের ঘটনাটা আগাগোড়া সব ভাবতে লাগলুম, রমা যাবার সময় বলে গিয়েছিল "কাল রাত্রে এইখানে এসো যা চাও তাই দেব"। জানতুম রমা আমাকে ধাপ্পা দিয়ে গিয়েছে তার আর দেখা পাওয়া যাবে না, সে হয়ত এতক্ষণ ট্রেণে আর একটা শিকার ধরবার জন্য টোপ ফেলে বসে আছে। কিন্তু হাজার হলেও আমি একটা সাধারণ মানুষ তাই কিছুতেই তার সেই আলিঙ্গন, মিষ্টি কথা ভুলতে পারছিলুম না। কোলকাতায় কোথায় তারা থাকে তাও জেনে নিই নি। অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করলুম, তারপর রাত হল বলে উঠব মনে করছি এমন সময় পেছন থেকে আচমকা কে আমার

চোখ টিপে ধরল। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলুম তারপর হাত দিয়ে জোর করে চোখ ছাড়িয়ে নিতেই রমা খিল্ খিল্ করে হেসে আমার পাশে এসে একেবারে গাঘেঁসে বসল। আমি অবাক হয়ে বললুম "আরে তুমি এখনও কোলকাতায় যাওনি? তবে যে শুনলুম আজকের মেলে তোমরা চলে গিয়েছ"। রমা বললে "হ্যাঁ তুমি আজ যাবে বলেই আমরা যাচ্ছিলুম তোমাকে ষ্টেশনে না দেখতে পেয়ে ভাবলুম যে তুমি আজ আমার জন্য এখানে আসবে তাই আমার আর যাওয়া হল না, ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি"। আমি প্রথমটা রমাকে দেখে আনন্দিত হয়েছিলুম তারপর আবার আমার মনের মধ্যে ঘৃণা জেগে উঠল, আমি বললুম "তা আমি ত তোমাকে যতটাকা চেয়েছ দিয়েছি আবার কেন আমার ওপর দৃষ্টি"। রমা হেসেই বললে "আমি কি শনি না রাহু যে আমার দৃষ্টিতে তোমার সর্ব্বনাশ হবে"। তারপর আমার একটা হাত নিজের কোলের ওপর নিয়ে বললে "সত্যি আমি টাকার জন্য আজ আসিনি। এ কেবল আমার দুর্ব্বলতা তাই তোমাকে প্রবঞ্চনা করতে পারলুম না। তুমি আমাকে দিদির সম্মান দিয়েছিলে যা আজ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে দেয়নি। সবাই আমার দেহটাকে চায় তাই আমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে থাকি কিন্তু তুমি আমার মনটা জয় করেছ তাই আমি তোমার কাছে পরাজিত; কিছুতেই তোমাকে ফাঁকি দিতে পারলুম না। এই নাও তোমার সেই পঞ্চাশ টাকা, দরকার পড়লে ভবিষ্যতে বোনের দাবী করে চেয়ে নেব ধাপ্পা দিয়ে নেব না! এখন তবে চললুম ভাই কোনদিন তোমার দিদি হবার যোগ্য হতে পারলে আবার দেখা করব"। বলে আমার গালে একটা চুমু দিয়ে রমা চলে গেল। আমি আপত্তি করতে পারিনি। মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করে বসে থাকলুম। রমা চলে গেছে, জানিনা কবে তার দেখা পাব।



নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নিলু আমাদের গ্রামের ছেলে। টাটা কারখানায় লেবরেটরী ডিপার্টমেণ্টে ঝাড়পোছের কাজ করে আর সাহেবদের ফাই ফরমাস খাটে। বয়েস ছাব্বিশ সাতাশ বছর, সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেছিল তাই তার কাছে সাহেবদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা চালানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছুটিতে ছাটাতে যখন দেশে আস্‌ত তখন গাঁয়ের ছেলে বুড়ো, মেয়ে, মরদ, সবার কাছে তার কর্ম্মস্থলের গল্প এমন ভাবে ফেনিয়ে রং ফলিয়ে বলত যে মনে হত সে বুঝি একটা মস্ত রাসয়নিক। আমিও তার গল্প শোনা থেকে রেহাই পেতুম না। প্রথম প্রথম যখন তার ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেব 'দাঁনেশ মিয়া' সম্বন্ধে কিছু বলত তখন আমি ভাবতুম সে বুঝি কোন পশ্চিমা মুসলমানের কথা বলছে। কিন্তু নিলু বার বার বলত দাঁনেশ মিয়া বিলিতি সাহেব এবং যখন একদিন টিসকো রিভিউতে তার ছবি পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিলে তখন বুঝলুম সাহেবের নাম ডান্‌স্ মায়ার, নিলু উচ্চারনের সুবিধার জন্য, দাঁনেশ মিয়া বলে থাকে। কিন্তু এ চাকুরি নিলুর ধাতে সইল না। বাংলা দেশের জন্য, তার গ্রামের

জন্য কেবলই মন তার টানত তাছাড়া বেশি ছুটি পেত না বলে ক্রমেই তার মন বিগড়ে যেতে লাগল। কাট খোট্টার দেশ তার আর ভালো লাগে না। এদিকে গেল পূজোর ছুটিতে দেশে এসে ও পাড়ার খেঁদিকে বেশ ডাগর ডাগর দেখে তার মনে ধরে গেল। ছেলে বেলায় একসঙ্গে কত খেলা করেছে তারপর বছরখানেক আর দেখা সাক্ষাত হয় নি আর এরি মধ্যে খেঁদি এত বড় হয়ে পড়েছে। গালে বেশ মাংস লেগেছে, কেমন তুল তুল করে, হাসলে গালে টোপ খায়, হাত পা গুলো গোল গোল হয়েছে, পিঠের ওপর একরাশ কালো চুল। আঁটা সোঁটা নিরেট শরীর। দেখেই ত নিলু খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকল তারপর বেয়াক্কেলের মত দাঁত কেলিয়ে বলল, "বাস্‌রে, খেঁদি যে হঠাৎ মস্ত:বড় হয়ে পড়েছিস, গায়ে গতর লেগেছে দেখছি।" খেঁদি ঠিকরে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে বলে গেল। "মুখপোড়ার কথার ছিরি দেখ না, যেন ওনার খেয়ে পরে গতর করেছি।" নিলু হাঁদার মত এক গাল হেসে বাড়ী গেল। তারপর দিন সন্ধ্যে বেলা নিলু আবার ওপাড়ায় গিয়ে খেঁদির বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করতে লাগল। খেঁদি কাছাকাছি একটা সরকারী টিউবওয়েল থেকে এক কলসি জল নিয়ে ফিরছিল নিলুকে দেখেই হেসে ফেলল। নিলু ভরসা পেয়ে বললে "রাগ করেছিস্ খেঁদি? দুদিন পরেই আবার দেশ ছাড়া হব তখন তোর নিলুদার জন্য মন কেমন করবে না?" খেঁদি কথাটি বলল না, মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল, সে জানত নিলু বিদেশে চাকরি করে, সেজন্য গত দিনের রূঢ় আচরণের জন্য সে একটু লজ্জিত হয়েছিল। এ অবস্থায় নিলু কি বলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে গেল। তারপর দিন নিলু আবার খেঁদিকে নিরিবিলি পেয়ে বললে "খেঁদি আমার ত ছুটি ফুরিয়ে এলো, কালই রওনা হব।"

খেঁদি খানিক চুপ করে থেকে বলল, "তা ও ছাই চাকরি না করলেই হয়। গাঁয়ে থেকে জমিজমা দেখলে তবু সে গুলো রক্ষে হবে।" নিলু একটু পুলকিত হয়েই বলে ফেলল "আচ্ছা খেঁদি আমি গাঁয়ে থাকলে তুই খুব খুশি হোস্—না?" কোন জবাব না পেয়ে নিলু সরাসরি মনের কথা খুলে বলল "খেঁদি তুই আমায় বে করবি।" খেঁদি যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল, নিলুর সামনে আর দাঁড়াতে পারল না, যাবার সময় বলে গেল "ধেৎ, আমি কি বিয়ে দেবার মালিক?" নিলু এই জবাব পেয়েই আহ্লাদে নাচতে নাচতে বাড়ী গিয়েই তার বৃদ্ধা মাকে বলল "মা আমি খেঁদিকে বে ক'রব, তার বাপকে তুমি আজই বলে এসো।" মা অবাক হয়ে বলল "শোন পাগলের কথা, আমি কবে সব ঠিক করে রেখেছি, খালি তুই রাজি হলেই পাকা কথা হয়ে যায়।" নিলু তাড়া দিয়ে বলে "আরে আমি রাজি না হলে কি অমনি বলছি খেঁদিকে বে করব। তুমি দিন ঠিক কর আমি চাকরিতে জবাব দিয়ে শিগ্গির ফিরে আসব।" নিলুকে বিদেশে পাঠাতে তার মা কোন কালেই রাজি ছিল না—আজ তার সুবুদ্ধি ফিরেছে দেখে ভারি আনন্দিত হল।

নিলু জামসেদপুর চলে গেল আর এদিকে তার মা খেঁদির বাপের সঙ্গে দর কষতে লেগে গেল। নিলু প্রথমে সাহেবদের কাছে লম্বা ছুটির প্রার্থনা করলে, সঙ্গে সঙ্গে তা নামঞ্জুর হয়ে গেল তখন সে চাকরিতে ইস্তফা দিতে চাইল কিন্তু তাও বাতিল হয়ে গেল উপরন্তু জরুরি চাকরি আইনে তাকে শ্রীঘরের ভয় দেখিয়ে দেওয়া হল। নিলু আপন মনেই বলে "এত আচ্ছা জাঁতি কলে পড়লুম! বে করব, ছুটি চাই—শালাচ্ছেলেরা তা দেবে না, চাকরি ছেড়ে দেব তাও পারব না, উল্টে শ্রীঘরের ভয় দেখায়, ইংরেজ রাজত্বে আছি, না মগের মুল্লুকে বাস করছি তার ঠিক নেই। আচ্ছা তুমি

কত বড় দাঁনেশ মিয়া হয়েছ আমি দেখে নেব। নিলু বাড়ুজ্জেকে ভয় দেখিয়ে আঁটকে রাখবে বললেই হল আর কি। তোদের কারখানার কাঁথায় আগুন, যা দু'পয়সা করে খাচ্ছিলি তা বামুনের অভিশাপে চুলোর দোরে যাবে···ইত্যাদি।" সবই বৃথা আস্ফালন হল। নিলু টাইম মত প্রত্যহ কাজে হাজিরা দিতে লাগল।

কিছুদিন পরে হঠাৎ ঘটে গেল এক বিপর্য্যয়—নিলু মারা গেল। লেবরেটরী ঘরে এ্যাসিডের শিশি নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে কোনটার সঙ্গে কি মিশে গিয়ে এক বিষাক্ত গ্যাস তৈরী হয়ে নিলুকে মুহুর্ত্তের মধ্যে অজ্ঞান করে ফেলল। অল্প সময়ের মধ্যে এক কর্ম্মচারী নিলুকে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের কাছে রিপোর্ট করল। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তারা কিছুই করতে পারল না তখন টাটার হাঁসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হল। বড় বড় ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে হাল ছেড়ে দিল। রিপোর্ট দিল যে, নিলু গ্যাস পয়জনিংএ বহু আগে মারা গেছে। হয়ত ততক্ষণে অন্তরাল থেকে নিলুর আত্মা হাসছে, আপন মনে বলছে, "এবার ত চাদ তোমাদের আইন আর খাটল না, কই পারলে আঁটকে রাখতে?" কিম্বা হয়ত খেঁদির জন্য দুঃখ করছে, সেত মরতে চায় না, সে চায় খেঁদিকে বিয়ে করতে, তাকে যে কথা দিয়ে এসেছে।

নিলুর দেহ মর্গে রাখা হয়েছে। পরদিন সকালে ময়নাতদন্ত হবে। এদিকে দেশে নিলুর মৃত্যুসংবাদ কারখানা থেকে যথানিয়মে চলে গেল! নিলুর মা আর খেঁদি সবচেয়ে বেশি আঘাত পেল।

রাত তখন চারটা। হাসপাতালে মরার ঘরে একটা উঁচু লম্বা টেবিলের ওপর নিলুর নিথর নিশ্চল দেহ পড়ে আছে—আশপাশে আরও গোটাকতক

মৃত দেহ রয়েছে—সেগুলো আরও বাসি, বিকট দুর্গন্ধ ছাড়ছে। বৈদ্যুতিক আলোতে ঘরটা আলোকিত। উঁচু জানালা দিয়ে ঝির ঝির করে ভোরের হাওয়া ঘরের মধ্যে আসছে। এমন সময় নিলুর সমস্ত শরীরটা একবার কেঁপে উঠল, নিলু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল তারপর চোখ মেলেই ধড় মড় করে উঠে বসল, ফ্যাল ফ্যাল করে চারিদিক দেখতে লাগল। উৎকট দুর্গন্ধে তার শ্বাসরোধ হয়ে এল, সে কাঁপতে কাঁপতে টেবিল থেকে নামল, টলতে টলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শেয়াল কুকুরের জন্য দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। হতাশ হয়ে নিলু ফিরে এসে দাঁড়াল। ভাবতে লাগল সে এখন কোথায়। জীবনে কখন মর্গ দেখেনি। এতগুলো মড়ার বিভৎস মূর্ত্তি দেখে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একবার ভাবল এ মড়ার রাজ্যে সে কি করে এলো, হয়ত সে নিজেও বেঁচে নেই, মরে ভূত হয়েছে। তারপর মার কথা মনে পড়ল মনে পড়ে গেল খেঁদির কথা, তার গাঁয়ের ছবি, তার কারখানায় লেবরেটরী ঘর, বিষাক্ত গ্যাসের কথা। সে আর ভাবতে পারলে না, সে এখন মুক্তি চায়, এ নরক থেকে বাইরে যেতে চায়। রাত কত তা বুঝতে পারল না, কখন দরজা খুলবে কে জানে, কোন দিন খুলবে কি না তাই বা কে বলতে পারে।

তার মাথা গরম হয়ে উঠল, সে উন্মাদের মত ছট্‌ফট্ করতে লাগল। জানালাগুলো এত উঁচুতে যে, নাগাল পাওয়া যায় না। নিলু একটা উঁচু টেবিল প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে জানালার ধারে নিয়ে গেল তারপর জানালা টপকে বাইরে ঘাসের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর হাস-পাতালের পাঁচিল টপকে রাস্তায় এসে পড়ল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। পথ চিনে নিজের বস্তিতে পৌছতে অসুবিধা হল না। নিজের ঘরে না

ঢুকে সে সোজা তার মাদ্রাজি বন্ধু নারায়নমকে ডেকে তুলল। তার আগের দিন সন্ধ্যায় নিলুর মৃত্যু সংবাদ বস্তিতে প্রচার হয়ে গিয়েছিল এবং তার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। নারায়নম চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজা খুলেই ঘাটের মড়ার মত নিলুকে সামনে দেখেই দড়াম করে দরজা



বন্ধ করে দিল। নিলু বাইরে থেকে হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি মিশিয়ে বোলতে লাগল যে সে মরে নি, বেঁচে আছে। আপশোষ করতে লাগল কেন সে মাদ্রাজির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, এখন দরকারের সময় একটা কথাও বোঝাতে পারছে না। ঘণ্টাখানেক মাথামুণ্ডু বকে যাবার পর

নারায়নম সাহস করে দরজার ফাঁক দিয়ে ভাল করে নিলুকে দেখে নিল। যখন আর কোন সন্দেহই থাকল না যে নিলু ভুত নয়—জ্যান্ত ফিরে এসেছে, তখন তাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা শুনল এবং বুঝতে চেষ্টা করল। পাছে বস্তির লোক হঠাৎ নিলুকে দেখে ঘাবড়ে যায় সেই জন্য নারায়নম পরামর্শ দিল যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন ঘরের বার না হয়। নিলু চার পাঁচ দিন নারায়নমের ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দিলে। নারায়নম এসে খবর দিল যে মর্গ থেকে নিলুর লাশ উধাও হওয়ার জন্য তিনজন ডোমের চাকরি গিয়েছে তারা নাকি অসাবধানতাবশতঃ দরজা বন্ধ না করায় শিয়ালে নিলুর দেহ টেনে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে নিলুর যায়গায় নতুন লোক এসে গেছে এ অবস্থায় নিলু তার চাকরি ফিরিয়ে পাবে বলে ভরসা হয় না। নিলু চাকরির পরোয়া করে না, নারায়নমকে বলল সে দেশে ফিরে যাবে। দেশে যাবার দিন সে বাজারে গিয়েছে কি একটা কিনতে পথে দেখল তার বড় সাহেব দাঁনেশ মিয়া গাড়ী থেকে নেমে একটা বড় দোকানে ঢুকছে। নিলু ছুটে গিয়ে সাহেবকে সেলাম ঠুকে বললে, "সাহেব আমার চাকরি বিনা কসুরে গেল?" সাহেব নিলুকে সাত দিন আগে চোখের সামনে মরতে দেখেছে—আজ তাকে সশরীরে সামনে দেখে ভয়ানক রকম ভড়কে গেল, দোকানে না ঢুকে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বাড়ী পালাল। নিলু ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে এক চোট হেসে নিল। আপন মনেই বললে "শালার সাহস বলিহারি, এই নিয়ে রাজ্য শাসন করতে এখানে এসেছে, বাঁদরের পাল কবে যে দেশ ছাড়া হবে, উঃ ভাগ্যিস্ মরেছিলুম নইলে এদের জুলুমের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার পেতুম না। এখন ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি।" নিলু দেশে ফিরল। ষ্টেশন থেকে নেমে মেঠো পথ ধরে বাড়ী

ফিরছে—তখন বেলা পড়ে এসেছে। খেঁদিদের বাড়ীর কাছ দিয়েই রাস্তা। ঘুরে দেখল কলসি কাঁখে খেঁদি টিউবওয়েল থেকে জল আনতে যাচ্ছে। নিলু পা চালিয়ে খেঁদির কাছাকাছি গিয়ে বললে "এই দ্যাখ খেঁদি, আমি ফিরে এসেছি, বে করবি না?" খেঁদি আচমকা নিলুর গলা শুনে এবং পিছন ফিরে তাকিয়ে নিলুকে দেখেই "মাগো" বলে কলসি ফেলে পড়ি কি মরি করে ছুটে পালিয়ে গেল। নিলু তখন বুঝতে পারল কেন খেঁদি ভয় পেয়েছে। সে আপন মনে বলল "শালারা এখানেও আমাকে মেরে রেখেছে, এখন মার কাছে যাই কি করে। সবাই ত ভূত বলে মেরে তাড়াবে।" যাহোক্ সাঁঝের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সে কোন রকমে বাড়ী পৌঁছল এবং ঘাপচি মেরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকল যাতে সুবিধা মত তার মার সামনে যেতে পারে আর তার মা বেশি ভয় না পায়। একটু পরেই খেঁদির মা হাজির হল "বলি, বড় গিন্নি কি হবিষ্যির জোগাড় করছ। এদিকে খেঁদি আমার বড় ভয় পেয়েছে, জ্বর বিকার না হলে বাঁচি।" নিলুর মা বেরিয়ে এসে খেঁদির কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করল। খেঁদির মা খানিকটা হা হুতাস করে নিয়ে বলল "হাজার হোক্ অপঘাতে বাছার মরন হয়েছে, ভাল করে শ্রাদ্ধ পিণ্ডির ব্যবস্থা না করলে সেও ত শান্তি পাবে না। খেঁদি বলছিল যে, সে একটু আগে জল আনতে যাবার সময় পষ্ট দেখতে পেল নিলু হন্ হন্ করে তার দিকে ধাওয়া করে আসছে আর বলছে খেঁদি বে করবি নে? শুনে ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিল। এদিকে ছেলের বাপদের যা হাঁকাই—কি করে যে ছুঁড়িটাকে পার করব তা ভেবে পাই না।" আরো খানিকটা সাত পাঁচ বাজে বকে খেঁদির মা বিদায় হল। তারপর নিলু বেরিয়ে এসে সোজা তার মার হাত চেপে ধরে বলল "ভয় পেও না মা, চুপ করে আমার সব কথা শোন। আমি মরিনি

আমার গা ছুঁলেই বুঝতে পারবে, ছায়া দেখলেই বুঝতে পারবে। শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম তাতেই এত কাণ্ড।" বলে আগাগোড়া সব বললে। তখন নিলুর মার আনন্দ দেখে কে। গ্রামময় রটে গেল নিলুর প্রত্যাবর্ত্তনের খবর। খেঁদির মা, খেঁদি সকালে উঠে খবর নিতে এল। নিলু খেঁদিকে একা পেতেই বলল "কিরে খেঁদি বে করবি? নইলে এবার সত্যি মরে ভুত হয়ে আসব।" খেঁদি বললে "আমিও তাহলে মরে পেত্নি হব।"

শেষ পর্য্যন্ত খেঁদি পেত্নি না হয়ে নিলুর পত্নী হল।



ঘটনাটা ঘটেছিল গত ৯ই মার্চ্চ তারিখে। অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিকেলে বাড়ী এসে দেখি টেবিলের ওপর একটা পোষ্টকার্ড। আমার বাল্যবন্ধু মঞ্জু সেন লিখেছে তালপুকুর থেকে তার আগের দিন। চিঠি পড়ে প্রথমটা খুব অবাক হয়ে গেলুম। যে আজ সাত বছর আমার কোন খোঁজ নেয়নি সে কেন হঠাৎ আমাকে বিশেষ করে দেখা করবার জন্য লিখেছে। সন্ধ্যা সাতটা কত মিনিটে একটা ট্রেণ ছিল। বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে বেরিয়ে পড়লুম। একটা ছোট চামড়ার স্যুটকেসে দু'একখানা বেশি কাপড় নিয়ে নিলুম। অনেককাল পরে যাচ্ছি, সেজন্য মঞ্জুর ছেলেপুলের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে নিলুম। যখন শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌছুলুম তখন ট্রেণ ছাড়তে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। থার্ডক্লাস টিকিট কাটবার জন্য এত লম্বা 'লাইন' হয়েছে যে সেখানে দাঁড়ালে টিকিট পাবার অনেক আগেই ট্রেণ ছেড়ে দেবে। ছুটলুম ইণ্টারের টিকিট যেখানে সেই জানালায়। স্যুটকেসটা নামিয়ে রেখে পয়সা বার করছি এমন সময় এক ভদ্রলোক (?) আমার গা ঘেঁসে দাড়িয়ে বললেন "আপনি ত আচ্ছা আহাম্মক।" আমার আহাম্মুকিটা কোথায় দেখতে পেল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলুম "কেন ?" ভদ্রলোক হাসতে হাসতে

বললেন "আপনি যে সুটকেসটা নামিয়ে রেখে টিকিট কাটছেন কেউ যদি এসে ওটাকে নিয়ে এমনি করে ছুটতে আরম্ভ করে ?" বলেই আমার সুটকেসটা নিয়ে তিনি ছুটলেন। আমি ভাবছিলুম ভদ্রলোক খানিকটা ছুটে আবার ফিরে এলেই তাঁর মূল্যবান উপদেশের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাব কিন্তু কৈ তিনি ত ফিরবার নাম করেন না, ছুটতে ছুটতে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। পাশে কয়েকজন লোক আমার দুরবস্থা দেখে বোধ করি কৌতুক অনুভব করছিলেন। একজন বললেন "কি মশাই দাঁড়িয়ে দেখছেন কি ? এখনও বুঝলেন না আপনি আহাম্মক কেন ?" আবার কোন উপদেশের আশঙ্কায়, নতুন সুটকেসের মায়া ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেণে উঠলুম। একটু পরেই ট্রেণ ছাড়ল, আমিও হাঁফ ছাড়লুম।

এখানে গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার। তালপুকুরের বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় অশোক সেনের একমাত্র পুত্র মঞ্জু আর আমি কোলকাতায় একই স্কুল এবং একই কলেজ থেকে পাশ করি। সে আজ চোদ্দ-পনর বছর আগের কথা। পাঠ্যাবস্থায় আমি প্রতি শনিবারেই তালপুকুর যেতুম। মঞ্জুও মাঝে মাঝে আমাদের দেশে বেড়াতে আসত। আমরা দু'জনে ছিলুম অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে মঞ্জুকে নিয়ে আমাদের গ্রামে বেড়াতে গেলুম। সেই সময় আমার বিয়ের কথা চলছিল আমাদেরই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার বঙ্কুবাবুর সুন্দরী কন্যা বীথির সঙ্গে। বঙ্কুবাবুর অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তথাপি তিনি তাঁর একমাত্র সন্তান বীথিকে সুশিক্ষিতা করেছিলেন। বীথির রূপে ও গুণে আমি যথার্থই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বীথি ছোট্ট থেকে আমাকে 'অনিলদা' বলে ডাকত এবং আমাকে দাদার মতই ভক্তি ও স্নেহ করত। আমার

প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। সেইজন্য তার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালবাসা শুধু মনের মধ্যেই চাপা ছিল, কোন দিনই মুখ ফুটে প্রেম নিবেদন করবার প্রয়াস করিনি। আমার সে গভীর ভালবাসার কথা কেউই জানত না এমন কি বীথিও না। বিয়ের কথা শুনে খুবই পুলকিত হয়েছিলুম কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে বিজ্ঞের মত বাবাকে জানিয়ে দিলুম যে একটা চাকরির জোগাড় না হলে বিয়ে করব না। মঞ্জু আমাদের বাড়ীর ছেলের মতই থাকত; মাঝে মাঝে আমরা দু'জনে বঙ্কুবাবুর বাড়ীতে বেড়াতে যেতুম। বঙ্কুবাবু মঞ্জুর পরিচয় পেয়ে এবং তার সঙ্গে আলাপ করে খুবই আনন্দিত হলেন। কয়েকদিন পর এমন হল যে মঞ্জু আমাকে সঙ্গে না নিয়েই বঙ্কুবাবুর বাড়ী যেতে আরম্ভ করল। আমার বিয়ের কথা অনেকদিন চাপা পড়ে গিয়েছিল। মঞ্জুকে এ সবের কিছু জানান দরকার মনে করিনি। তাছাড়া কেন জানি না আমার মনে মনে একটা ভয় ছিল যে বিয়ে করলে আমাদের বন্ধুত্ব শিথিল হয়ে যেতে পারে যা আমি কোন কারণেই হতে দিতে রাজি ছিলুম না। কিন্তু বন্ধুত্বের চরম পরীক্ষা দিতে হল। একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে মঞ্জু আমাকে জানাল যে সে বীথিকে দেখেছে, তাকে ভালবাসে আর তাকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হবে এবং তাদের মিলনের ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। মঞ্জু শৈশবে তার বাবাকে হারিয়েছিল সুতরাং তার অভিভাবক সে নিজেই—বঙ্কুবাবু ত হাতে চাঁদ পেলেন। তাঁর মত গরীবের মেয়ে যে জমিদারের গৃহিণী হবে একথা তিনি কোনদিন কল্পনায় আনতে পারেন নি। আমি যখন সানন্দে (!) এই বিয়ের প্রস্তাব বঙ্কুবাবুর কাছে করলুম তখন আমার আদর যত্ন দেখে কে, ভাবটা যেন তিনি আমায় চিরকাল মাথায় করে রাখবেন। অবশ্য

বিয়ের পর তিনি বড় একটা আমার সঙ্গে কথাই বলতেন না বরং লোকমুখে শুনেছি তিনি নাকি বলেছেন যে আমার মত একটা অপদার্থের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি যে তাঁর আদরের বীথিকে জলে ভাসিয়ে দেননি সেইজন্য বিধাতাকে সহস্র ধন্যবাদ। বাবা আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আর বিয়ের কথা তোলেননি আর আমিও আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করা প্রয়োজন মনে করিনি। মঞ্জুর বিয়ের পর আমি প্রায়ই তালপুকুরে তাদের বাড়ী যেতাম। মঞ্জু আমাকে আগের মতই আপ্যায়িত করত এবং বীথিও আমাকে দাদার মত আদর যত্ন করত। তাদের ছোট্ট সংসারটি আমার কাছে অত্যন্ত মধুর ছিল। কিন্তু আমি এ আনন্দটুকুও বেশীদিন ভোগ করতে পারলুম না। বঙ্কুবাবু বাদ সাধলেন। তিনি তাঁর জামাইকে একদিন এমন এক সতর্কবাণী শুনালেন যে তারপর থেকে আমার মনে হল যেন মঞ্জু আমাকে কেমন একটা সন্দেহের চক্ষে দেখে এবং তাদের বাড়ী যাওয়াটাও সে যেন পছন্দ করে না। সেইখানেই হয়ে গেল আমাদের বন্ধুত্বের অবসান। তারপর সাত বছর হয়ে গেছে আমি কোনদিন তার খবর নিইনি সেও যেন আমার কাছ থেকে রেহাই পেল।

সাত বছর পরে কোন এক অজ্ঞাত কারণে মঞ্জু আমাকে দেখা কররার জন্য পোষ্টকার্ড লিখেছে। মঞ্জুর একটা খোকা হয়েছিল দেখে এসেছিলুম তারপর তার আর কোন ছেলেপুলে হয়েছিল কিনা জানি না। তবে বাঙ্গালীর প্রতি মা ষষ্ঠির অপার কৃপা তাই ভাবলুম যে সাত বছরে সাতটি না হোক অন্ততঃ এক গণ্ডা সন্তানের পিতা মঞ্জু নিশ্চয় হয়েছে। সেই অনুমানে কিছু মিষ্টি সঙ্গে নিয়েছিলুম। খাবারের ছোট চ্যাঙ্গারিটা যাতে খোয়া না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গন্তব্য ষ্টেশনে গিয়ে

পোষ্ট কার্ড

যখন পৌছুলুম তখন রাত প্রায় ন'টা। প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে যখন বেরিয়ে আসছি তখন একটা আট, ন' বছরের ছেলে কোত্থেকে ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে আমায় জিজ্ঞাসা করল "কোথায় যাবেন?" আমি উত্তর দিলাম "তালপুকুরের জমিদার মঞ্জু সেনের বাড়ী" ছেলেটি বলল "ওঃ আসুন, আসুন, দিন ওটা আমার হাতে।" বলে খাবারের চ্যাঙ্গারিটা আমার হাত থেকে নিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। আমি ভাবলুম মঞ্জু বোধ হয় চাকর পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আবার ভুল! ছোড়াটা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন পাত্তা পেলুম না। ছোঁড়াটার বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না।

দুই হাতেরই ভার লাঘব হয়েছে; একটা সিগারেট ধরিয়ে নির্জ্জন পথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। ষ্টেশন থেকে মঞ্জুদের বাড়ী ক্রোশ তিনেকের রাস্তা। যান-বাহনের কোন ব্যবস্থা নাই। আগে যখন আসতুম তখন জমিদারের জুড়ি গাড়ী আমাদের জন্য অপেক্ষা করত। সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমার রাত্রি। জ্যোস্নায় পথ হাঁটতে কোন কষ্টই হচ্ছিল না। ছোট রাস্তার দুধারে দিগন্তব্যাপী খোলা মাঠ। ঝির্ ঝির্ করে বসন্তের হাওয়া বইছে। মঞ্জুদের বাড়ী যখন পৌছুলুম তখন রাত অনেক হয়েছে। কারও কোন সাড়া শব্দ নেই দেখে একটু আশ্চর্য্য হলুম। বাড়ীটা দেখে মনে হল অনেকদিন মেরামত করা হয়নি। চারিদিকে জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। আশেপাশে কোথাও জনমানবের চিহ্ন মাত্র নেই। চাকর বাকর কেউ কোথাও নেই। বাগান পেরিয়ে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে মঞ্জুর নাম ধরে ডাকতে লাগলুম। উত্তর পেলুম না। দরজায় খুব জোরে আঘাত করলুম। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে মঞ্জু আমাকে

দেখেই বললে "কিরে অনিল, কোন্ ট্রেণে এলি, এত রাত হোল যে ? আয় ভিতরে আয়, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?" ঘরের ভিতর গেলুম। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। বুঝলুম মঞ্জুর অবস্থা কোথায় গিয়ে নেমেছে। জমিদারির আর কিছু নেই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে এখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বসেছে। আমি মঞ্জুকে শুধু বললুম "একটা আলো আন্‌তে পারিস্ ?"

মঞ্জু "সারা বাড়ীতে আলো যে মাত্র একটা ভাই।"

আমি—"আচ্ছা মঞ্জু একটি কথা জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারছি না, রাগ করিস্ না যেন, তোর জমিদারির আয় কি কমে গেছে ?"

মঞ্জু ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিল "জামদারিই নেই তার আবার আয়। এখন এখানকার জমিদার আমার পাষণ্ড শ্বশুর। আমার কিছু আয় নেই তা ছাড়া একটা পয়সা রোজগার করবার মুরদ নেই। যাক্ সে অনেক কথা পরে বলব। তুই আসবি আমি জানতুম তাই তোর জন্য ভাল চুরুট কিনে রেখেছি, ততক্ষণে একটা ধরা, আমি খাওয়ার জোগাড় দেখি।"

চুরুটটা ধরিয়ে একটা ভাঙ্গা ছোবড়া বেরুন সোফার উপর গা এলিয়ে দিলুম। ভাবছিলুম অদৃষ্টের কি পরিহাস! কতক্ষণ ঐভাবে ছিলুম জানি না, আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হল হঠাৎ নারীকণ্ঠের এক বিকট গোঙ্গানি এবং পর মুহূর্ত্তে একটা বন্দুক ছোড়ার শব্দে। অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ীর ভিতর ছুটে গেলুম। পশ্চিম দিকের শোবার ঘর থেকে শব্দটা এসেছিল। সে ঘরটা তখন চাঁদের আলোয় আলোকিত। ঘরে ঢুকেই যা দেখলুম তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, হাত পা কাঁপছিল। দেখি ঘরের মাঝখানে কড়ে থেকে ঝুলছে বীথি। গলায় তার শাড়ীর ফাঁস, আর এক কোণে পড়ে আছে মঞ্জু, নাক, কাণ দিয়ে

বেগে রক্তধারা ছুটছে, পায়ের কাছে পড়ে আছে তাদের দোনালা বন্দুকটা। একটা মেঘের টুকরা চাঁদকে ধীরে ধীরে গ্রাস করল।



অন্ধকার সমস্ত ঘরটাতে জমাট বেঁধে বসল। চারিদিক নিস্তব্ধ নিথর।

শুধু আছে ঝিল্লির একঘেঁয়ে একটা রব আর দূরে বহুদূরে মাঝে মাঝে এক আধটা শিয়াল কুকুরের ডাক। আমার হাত পা অবশ অসাড় হয়ে এল। মনেরমধ্যে সমস্ত শক্তির সঞ্চার করে ছুটে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ী থেকে। উপস্থিত বুদ্ধি আমাকে দ্রুতবেগে থানার দিকে নিয়ে চলল; সেও আবার চার ক্রোশ পথ। এই সুদীর্ঘ পথ ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর নিয়ে কি করে যে অতিক্রম করেছিলুম তা এখন ভাবলেও আতঙ্কে শিউরে উঠি। যখন থানায় পৌঁছুলুম তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। বহুকষ্টে থানার দারোগা বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ করলুম। তিনি বেরিয়ে এসে বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "কি চাই ?"

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম "ভয়ানক বিপদ দারোগা বাবু, আমি তালপুকুরের মঞ্জু সেনের বাড়ী থেকে আসছি।"

দারোগা—"মঞ্জু সেন! যিনি আত্মহত্যা করেন এবং যাঁর স্ত্রী গলায় দড়ি দেন ?"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা আপনি আমার আগে খবরটা কি করে জানতে পারলেন ?"

দারোগা বাবু রেগে বললেন "আমি জানব না ত কে জানবে ? আমি নিজে এনকোয়ারিতে গিছলুম; সে আজ তিন বছর হতে চলল, একদোল পূর্ণিমার রাত্রে ঘটনাটা ঘটেছিল।"

আমি ততোধিক বিস্মিতভাবে বললুম "তি—ন ব—ছ—র আ—গে!" দারোগাবাবু চটে গিয়ে বললেন "মশাই কি মস্করা করবার আর জায়গা পেলেন না ? ভালোয় ভালোয় যদি এইবেলা সরে না পড়েন তাহলে বিপদে পড়তে হবে বলে দিচ্ছি।"

আর বাক্যব্যয় না করে ফিরবার পথ ধরলুম। শুধু শুনতে পেলুম দারোগাবাবু ভিতরে যাবার সময় বলছেন "যতো সব পাগল।" যখন মঞ্জুদের বাড়ীর সামনে এলুম তখন বেশ বেলা হয়েছে। দিনের আলোয় গতরাত্রের রহস্যটা যদি কিছু উদ্‌ঘাটন করতে পারি সেই আশায় বাড়ীর ভেতরটা দেখতে গেলুম। কিন্তু কাল যে দরজা দিয়ে ভিতরে গিয়েছি এবং বেরিয়ে এসেছি সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম কি করা যায় এমন সময় কে যেন আমায় জিজ্ঞাসা করল "কাকে চাই।" পেছন ফিরে দেখি একটা মালিগোছের লোক। আমি জিজ্ঞাসা করলুম "বাড়ীতে কেউ থাকে নাকি?"

মালি : "ভূতের বাড়ীতে আবার কে থাকবে বাবু?"

আমি—"তুমি কে?"

মালি—"আমি এ বাড়ীর মালী।"

আমি—"ভূতের বাড়ীতে মালির কি দরকার? মাইনে দেয় কে?"

মালি—"আমাকে জমিদার এই বাড়ী দেখাশোনা করবার জন্য রেখেছেন।"

আমি—"এ বাড়ীতে যদি কেউ না থাকবে ত সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ কেন?"

মালি—"ও আমি বন্ধ করে রেখেছি, বাড়ীর ভেতর যেতে হলে পেছনের দরজার তালা খুলে যেতে হয়।"

আমি—"মালি, তোমার কাছে চাবি আছে? চলনা আমাকে একটু বাড়ীর মধ্যে নিয়ে। দুটো টাকা বখশিশ পাবে।"

মালি খুশি হয়ে আমায় পেছনের দরজা খুলে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল। যে ঘরে আমি ভাঙ্গা সোফায় বসে চুরুট খেয়েছি সেখানে গিয়ে দেখি

মেঝের ওপর আমার সেই অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটা পড়ে আছে। আমি মালিকে জিজ্ঞাসা করলাম "এ বাড়ীর চাবি আর কারো কাছে থাকে ?"

মালি জানাল যে কেবল তার কাছেই চাবি থাকে। আমি পশ্চিমের শোবার ঘরটা দেখতে চাইলাম। মালি ভীতকণ্ঠে বলল "ও ঘরটা দেখতে চাইবেন না বাবু, আর তাছাড়া ও ঘরের চাবি আমার কাছে নেই, ওটা তিন বছর একই ভাবে বন্ধ আছে।" মালিকে আরো অনেক প্রশ্ন করেও বিশেষ কোন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলুম না। ফিরবার সময় শুধু জিজ্ঞাসা করলুম "মঞ্জুবাবুর ছেলেপুলে কি ছিল বলতে পার ?"

মালি "ছেলে ত একটি, কোথায় থাকে জানি না তবে ষ্টেশনের ধারে মাঝে মাঝে দেখা যায়, বাবুদের এটা সেটা হাতাতে ছাড়ে না।"

যাক্ খাবারের চ্যাঙ্গারি তাহলে বেহাত হয়নি ভেবে একটু তৃপ্তি পেলুম। বঙ্কুবাবুর সঙ্গে দেখা করলে হয়ত অনেক খবর পেতুম কিন্তু সে কসাইটার সঙ্গে দেখা করতে রুচিতে বাধল। যখন অবসন্ন, ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে কোলকাতার বাসায় পৌঁছুলুম তখন বেলা দুপুর। প্রথমেই টেবিলের ওপর থেকে পোষ্টকার্ডটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখি যে চিঠিটা ৮ই মার্চ্চ তারিখে লেখা বটে কিন্তু তিন বছর আগে। চিঠিটা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে ঠিক তিন বছর পরে। কিন্তু আমি ভাবছি সেই চুরুটটির কথা !